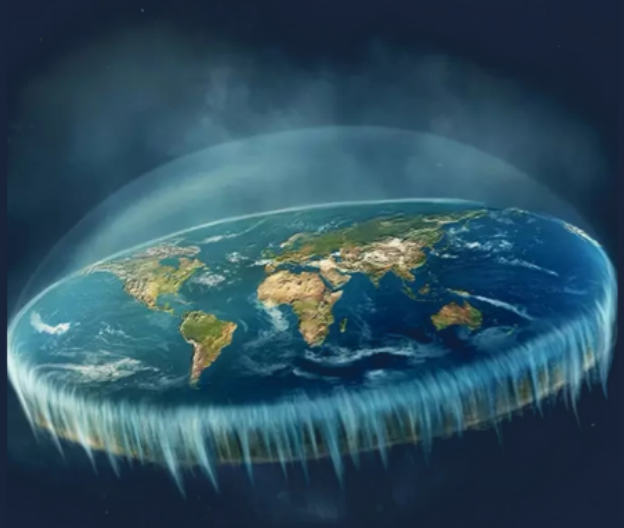
‘মাওসূআতু মাহাসিনিল ইসলাম ওয়া রাদ্দু শুবুহাতিল লিআম’

সংশয়: পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল?

নাস্তিক, খ্রিষ্টান, সংশয়বাদী ও সমতলবাদীদের জবাবে





‘মাওসূআতু মাহাসিনিল ইসলাম ওয়া রাদ্দু শুবুহাতিল লিআম’

সংশয়: পৃথিবী গোলাকার নাকি সমতল

নাস্তিক, খ্রিষ্টান, সংশয়বাদী ও সমতলবাদীদের জবাবে

The Globe Squad BD
(Telegram Channel)

সংশয়ের মূল পাঠ:

১. তারা বলে: কুরআন একবারের জন্যও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেনি যে পৃথিবীর আকৃতি গোলাকার।

২. তারা বলে: কুরআন দৃঢ়তার সাথে বলছে যে পৃথিবী সমতল, যেমন মহান আল্লাহর বাণী: "আমি তাকে বিস্তৃত করেছি", "তাকে সমতল করা হয়েছে", "তিনি একে ছড়িয়ে দিয়েছেন" এবং এ জাতীয় অন্যান্য আয়াতসমূহ।

৩. মুফাসসিরগণ কি পূর্বোক্ত শব্দগুলোর ব্যাখ্যায় পৃথিবীকে সমতল বলেছেন, যেমনটি এই লোকেরা দাবি করে?

৪. তারা বলে: মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই যায়েদ বিন আমর পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

৫. তারা বলে: মুহাম্মদ (সা.) যদি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী গোলাকার, তবে তিনি এ বিষয়ে ফিকহি বিধান প্রদান করতেন।

৬. পবিত্র বাইবেলে পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার কথা স্পষ্টভাবে উল্লেখ আছে।

৭. তারা বলে: জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছিলেন।

এর জবাব কয়েকটি দিক থেকে দেওয়া হলো:

প্রথম দিক: মুসলিম আলেমগণের ঐক্যমত (ইজমা) যে পৃথিবী গোলাকার, বিশেষ করে পূর্ববর্তী আলেমগণের এ ব্যাপারে ঐক্যমত রয়েছে।

দ্বিতীয় দিক: পূর্ববর্তী মুসলিম আলেমগণ কেবল পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বর্ণনাই দেননি, বরং তারা এমন সব আবিষ্কার উপস্থাপন করেছিলেন যা ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের প্রজ্ঞার পরিচয় দেয়। যেমন: পৃথিবীর অভিকর্ষ বল (মাধ্যাকর্ষণ) আবিষ্কার করা, পৃথিবীকে দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষরেখায় বিভক্ত করা এবং পৃথিবী একটি গোলক হলেও সুষম গোলাকার নয়—তা স্পষ্ট করা।

তৃতীয় দিক: জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছিলেন—এই সংশয়ের উত্তরে আমরা বলি যে, আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহি অথবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মাধ্যমে অর্জিত আবিষ্কার ব্যতীত পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রকৃত সত্য কারো পক্ষেই জানা সম্ভব ছিল না। এছাড়া যা কিছু ছিল তা ছিল নিছক ধারণা মাত্র, যা নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে ছিল না।

চতুর্থ দিক: তাদের এই কথার উত্তর যে: যায়েদ বিন আমর পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

পঞ্চম দিক: পৃথিবী গোলাকার হওয়ার পক্ষে কুরআন থেকে দলিলসমূহ। সেই সব আয়াতের ব্যাখ্যা প্রদানের মাধ্যমে যেগুলোকে পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট নয় বলে মনে করা হতে পারে, এবং এটি স্পষ্ট করা যে সেই আয়াতগুলো মূলত এর সপক্ষেই প্রমাণ বহন করে।

ষষ্ঠ দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "আর রাত দিনের অগ্রবর্তী হতে পারে না।"

এটি পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রতিই ইঙ্গিত দেয়।

সপ্তম দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "তিনি রাতকে দিনের ওপর জড়িয়ে দেন এবং দিনকে রাতের ওপর জড়িয়ে দেন" (সূরা আয-যুমার: ৫) যা পৃথিবীর গোলাকার হওয়াকে নির্দেশ করে।

অষ্টম দিক: কুরআন প্রমাণ করে যে, দিন ও রাতের পরিবর্তন পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার দলিল।

নবম দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "আর তিনিই সেই সত্তা যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন" এবং "আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি" সংক্রান্ত সংশয়ের উত্তর; কেননা তা পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়।

দশম দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "এবং ভূমির দিকে যে, তা কীভাবে সমতল করা হয়েছে" সংক্রান্ত সংশয়ের উত্তর এবং মানুষের আপেক্ষিক দৃষ্টির বিষয়টি স্পষ্ট করা।

একাদশ দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "আর এরপর তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন, তিনি তা থেকে তার পানি ও চারণভূমি বের করেছেন" (সূরা আন-নাযিআত: ৩০, ৩১) সংক্রান্ত সংশয়ের উত্তর।

দ্বাদশ দিক: এই কথার উত্তর যে: যদি কুরআন পৃথিবীর গোলাকার হওয়া সম্পর্কে জানতই, তবে তা সেই সময়ের মেরু অঞ্চলের মুসলিমরা যে সমস্যার সম্মুখীন হবে তার আগাম সমাধান প্রদান করত।

ত্রয়োদশ দিক: যারা বলে যে পৃথিবী গোলাকার হওয়া একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যা বাইবেলে উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের উত্তর।

চতুর্দশ দিক: প্রাচীন খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়; বরং সমসাময়িকদের মধ্যেও এমন কেউ কেউ আছেন যারা

এটি বিশ্বাস করেন।

পঞ্চদশ দিক: যৌক্তিক পদ্ধতিতে পূর্ববর্তীদের নিকট পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করা।

বিস্তারিত জবাব নিচে দেওয়া হলো:

প্রথম দিক: পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়ে মুসলিম আলেমদের ঐকমত্য, বিশেষ করে তাঁদের মধ্যে যারা পূর্বসূরি।

১. ইবনে হাযম হিজরি চতুর্থ শতাব্দীতে বাস করতেন। তাঁর সময়ে সাধারণ মানুষ বলত যে পৃথিবী গোলাকার নয়। কিন্তু তিনি এই মত পোষণ করতেন যে পৃথিবী গোলাকার; কারণ এটাই হচ্ছে গবেষক আলেমদের কথা। ইবনে হাযম বলেছেন: তাঁরা (অর্থাৎ আলেমগণ) বলেছেন—নিশ্চয়ই প্রমাণাদি দ্বারা এটি সঠিকভাবে সাব্যস্ত হয়েছে যে পৃথিবী গোলাকার। সাধারণ মানুষ তা ভিন্ন কথা বলে। আমাদের উত্তর হলো (আল্লাহর তাওফিকে) নিশ্চয়ই ইলমের কারণে ইমামতের যোগ্য মুসলিম আইম্মাদের মধ্য থেকে কেউই পৃথিবীর গোলাকার হওয়াকে অস্বীকার করেননি। তাঁদের কারো থেকেই এ ব্যাপারে একটি শব্দও (অস্বীকৃতিমূলক) সংরক্ষিত নেই; বরং কুরআন ও সুন্নাহর প্রমাণাদি এর গোলাকার হওয়ার পক্ষেই এসেছে। (১)

(১) আল-ফাসল ফিল মিলাল ওয়াল আহওয়া'ই ওয়ান নিহাল, (২/৭৮)

২. শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.)-কে এমন দুজন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যারা আসমান ও জমিনের প্রকৃতি নিয়ে তর্কে লিপ্ত হয়েছিল যে, এই দুটি কি গোল বস্তু কি না? তাদের মধ্যে একজন বলেছিল: গোল। অন্যজন এই বক্তব্য অস্বীকার করেছিল এবং বলেছিল: এর

কোনো ভিত্তি নেই এবং তা প্রত্যাখ্যান করেছিল। সঠিক কোনটি?

তিনি উত্তর দিলেন: মুসলিম আলেমদের নিকট আসমানসমূহ গোলাকার। মুসলিমদের একাধিক ইমাম এই ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন, যেমন: আবুল হুসাইন আহমাদ ইবনে জাফর ইবনুল মুনাদী — যিনি ইমাম আহমাদের অনুসারীদের দ্বিতীয় স্তরের একজন বড় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর প্রায় চারশটি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া ইমাম আবু মুহাম্মদ ইবনে হাযম এবং আবুল ফারাজ ইবনুল জাওযীও এই ঐকমত্য বর্ণনা করেছেন। আলেমগণ সাহাবী ও তাবেয়ীদের থেকে পরিচিত সনদে তা বর্ণনা করেছেন এবং আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের সুন্নাহ থেকে এর প্রমাণ উল্লেখ করেছেন। তাঁরা শ্রুতিজাত প্রমাণের মাধ্যমে এই বক্তব্য বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন। যদিও এই বিষয়ে গাণিতিক প্রমাণাদিও প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। আর আমি পরিচিত মুসলিম আলেমদের মধ্যে এমন কাউকে জানি না যিনি এটি অস্বীকার করেছেন, কেবল বিতর্ককারীদের একটি সামান্য দল ছাড়া যারা জ্যোতিষীদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ে তাদের মতবাদকে কলুষিত করে ফেলেছিল যখন তারা তাদের সাথে বিভিন্ন অবস্থা ও প্রভাব নিয়ে তর্কে জড়ায়। তারা যুক্তির ভিত্তিতে বলেছিল: এটি চতুর্ভুজ বা ষড়ভুজ বা অন্য কিছু হওয়া সম্ভব। তারা গোল হওয়ার বিষয়টিকে অস্বীকার করেনি বরং এর বিপরীতে অন্য কিছু হওয়াও সম্ভব বলে মনে করেছিল। আর এর বিপরীতে অন্য কিছু হওয়ার ব্যাপারে আমি জানি না। **তিনি বলেছেন যে,** এটি (পৃথিবী) গোলাকার নয়—এ কথা কেবল সেই সকল মূর্খরাই নিশ্চিতভাবে বলে যাদের কোনো তোয়াক্কা করা হয় না—এবং তিনি এই বিষয়ে দৃঢ়তা ব্যক্ত করেছেন। (১)

এর দিকে ইঙ্গিত করে তিনি আরও বলেছেন: জেনে রাখুন, পৃথিবী গোলাকার

হওয়ার বিষয়ে উলামাগন ইজমা পোষণ করেছেন। পৃথিবীর উপরিভাগের নিচে কেবল এর কেন্দ্রই রয়েছে, আর নিচের দিকের শেষ প্রান্ত হলো কেন্দ্র, যাকে বলা হয় ভারী বস্তুসমূহের কেন্দ্রস্থল (মুহিতুল আসকাল)। (২)

৩. ইয়াকুত আল-হামাভী বলেছেন: বিষুবরেখা (খততুল ইস্তাওয়া) পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত এবং এটি পৃথিবীর গোলকের দীর্ঘতম রেখা... এরপর তিনি বলেন: বরং আকাশও গোলাকার এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আবর্তিত হয়, আর এ বিষয়ে কোনো দ্বিমত নেই। (৩)

৪. ইবনুল জাওযী বলেছেন: আলেমদের মধ্যে এ বিষয়ে কোনো মতভেদ নেই যে, আকাশ হলো একটি গোলকের ন্যায় এবং এর অন্তর্ভুক্ত সকল নক্ষত্রসহ তা একটি গোলকের মতো দুটি স্থির ও অচল মেরুর ওপর আবর্তিত হয়; যার একটি উত্তর দিকে এবং অন্যটি দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। অনুরূপভাবে তারা এ বিষয়েও একমত হয়েছেন যে, পৃথিবী একটি গোলকের ন্যায়। এর প্রমাণ হলো সূর্য, চন্দ্র এবং নক্ষত্রসমূহ পৃথিবীর সকল প্রান্তের মানুষের কাছে একই সময়ে উদিত বা অস্তমিত হয় না, বরং পশ্চিমের আগে পূর্বে উদিত হয়। আর পৃথিবীর গোলকটি আসমানি গোলকের মাঝখানে অবস্থিত। (৪)

৫. আন-নিসাবুরি বলেছেন: ইসলামের প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেছেন: অকাট্য দলীলাদি দ্বারা এটি প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবী গোলাকার। (৫)

৬. আমি বলছি: পূর্ববর্তী আলেমদের মধ্যে যারা পৃথিবী গোলাকার হওয়ার কথা বলেছেন তারা হলেন: আল-গাজালী (৬), ফখরুরদ্দিন আর-রাজী (৭), ইবনুল কাইয়্যিম (৮), আল-মাকদিসী (৯), আয-যাহাবী (১০), আল-কালকাশান্দি (১১), ইবনু হাইয়ান (১২) আবু বকর আস-সুফী (১৩), ইবনুন

নাফীস (১৪), তুহফাতুল মুহতাজ এর রচয়িতা (১৫), ইবনু খুরদাদবিহ (১৬), আল-মাসউদী (১৭) এবং আবু মুহাম্মাদ আল-জুওয়াইনী (১৮)।

(১) মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৫৮৭) ও পরবর্তী অংশ।

(২) মাজমুউল ফাতাওয়া (৫/১৫০)।

(৩) মুজামুল বুলদান (২/৩৭৯)।

(৪) আল-মুনতাযাম গ্রন্থের ভূমিকা (১/১৮৩-১৮৪)।

(৫) তাঁর তাফসীর গ্রন্থে (৫/২০৮)।

(৬) মেয়ারুল ইলম গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ২), এবং অনুরূপভাবে দেখুন সুনানে নাসায়ীর ওপর আস-সিন্দীর টীকা (২/৪৯৫)।

(৭) তাফসীরে রাজীতে (২/৪৯১ - সূরা আল-বাকারাহ: ১৬৪)।

(৮) আত-তিবইয়ান ফী আকসামিল কুরআন।

(৯) আহসানুত তাকাসিম ফী মারিফাতিল আক্বালীম গ্রন্থের ভূমিকা।

(১০) মুখতাসারুল উলু (পৃষ্ঠা ৭৩)।

(১১) সুবহুল আশা (১/৪০৮)।

(১২) তাফসীরুল বাহরুল মুহীত (৭/৮০)।

(১৩) ওফায়াতুল আইয়ান-এ যেমনটি এসেছে, ইবনু খাল্লিকান (৪/৩৫৯)।

(১৪) শারহু কানুন ইবনু সিনা (পৃ. ১১২)।

(১৫) কিতাবুস সালাত (৪/৪০০)।

(১৬) কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক-এর ভূমিকা (০৪ পৃ.)।

(১৭) মুরুজুয যাহাব (১/২৫৩)।

(১৮) রিসালাতু ফি ইসবাতি আল-উঠা ওয়াল ফাওকিয়্যাহ (৮১/১)।

দ্বিতীয় দিক: প্রাচীন মুসলিম পণ্ডিতগণ কেবল পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বর্ণনার ওপরই ক্ষান্ত হননি; বরং তারা এমন সব আবিষ্কার নিয়ে এসেছেন যা ভূ-বিজ্ঞান সম্পর্কে তাদের সম্যক জ্ঞানের পরিচয় দেয়। যেমন: পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের আবিষ্কার, পৃথিবীকে দ্রাঘিমা রেখা ও অক্ষরেখায় বিভাজন এবং গোলাকার হলেও তা যে সুষম গোল নয়, বরং সুশৃঙ্খল বর্তুলাকার — তার বর্ণনা

১. ইবনু খুরদাদবিহ বলেছেন: পৃথিবী হলো সেই চুম্বক পাথরের ন্যায় যা লোহাকে আকর্ষণ করে। পৃথিবী দুই অর্ধাংশে বিভক্ত এবং তাদের মাঝখানে নিরক্ষরেখা অবস্থিত। এটি পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর দীর্ঘতম রেখা। আর এটি পৃথিবীর পরিধিতে ৩৬০ ডিগ্রি কোণে পরিবেষ্টিত। (১) আল -মাকদিসী (২) এবং ইবনুল জাওযী (৩) অনুরুপ কথা বলেছেন।

(১) কিতাবুল মাসালিক ওয়াল মামালিক (১/১)।
(২) আহসানিত তাকাসিম ফী মারিফাতিল আকালিম-এর ভূমিকা (২১/১)।
(৩) আল-মুনতাযাম (১/১৮৪)।

২. পৃথিবীর পূর্ণ গোলাকার না হওয়া: আশ-শরীফ আল-ইদরীসী বলেছেন: এটি সঠিক যে পৃথিবী গোলাকার, তবে তা পূর্ণ সুষম গোল নয়। (১)

৩. আস-সাফাদী বলেছেন: আমরা যদি পৃথিবীর যেকোনো এক স্থানে রশির এক প্রান্ত রাখি এবং রশিটি পৃথিবীর গোলকের চারদিকে ঘুরাই, তবে আমরা অপর প্রান্ত নিয়ে সেই একই স্থানে পৌঁছাব এবং উভয় প্রান্ত পরস্পর মিলিত হবে। (২)

৪. আল-মাসউদী বলেন: পৃথিবী দুই ভাগে বিভক্ত এবং তাদের মাঝখানে

রয়েছে নিরক্ষরেখা, যা পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত বিস্তৃত। আর এটিই হলো পৃথিবীর দৈর্ঘ্য; কারণ এটি পৃথিবীর গোলকের মধ্যে দীর্ঘতম রেখা। (৩)

৫. পৃথিবীর তিন-চতুর্থাংশ পানি:

ফখরুদ্দীন আল-রাযী বলেন: জেনে রাখুন যে, নিরক্ষরেখা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুই অর্ধাংশে বিভক্ত করে। যদি অন্য একটি বৃহৎ বৃত্ত একে সমকোণে ছেদ করে, তবে পৃথিবী উভয়ের মাধ্যমে চারটি ভাগে বিভক্ত হবে। আর বলা হয় (আল্লাহই সর্বজ্ঞ) নিশ্চয় তিন-চতুর্থাংশ পানি।

তিনি আরও বলেন: পৃথিবী একটি গোলক। আর যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে যে কোনো সময় কল্পনা করা হোক না কেন, তা একদল মানুষের জন্য ভোর, দ্বিতীয় দলের জন্য দুপুর, তৃতীয় দলের জন্য আসর, চতুর্থ দলের জন্য মাগরিব এবং পঞ্চম দলের জন্য ইশা। আর যখন বিষয়টি এমন হয়, তখন পৃথিবীর কোনো না কোনো প্রান্ত থেকে একদল মানুষ নামায আদায়ের জন্য কাবার দিকে মুখ করা থেকে কখনোই বিচ্ছিন্ন থাকে না। ফলে এই দিক থেকে (ইবাদতের) নিরবচ্ছিন্নতা অর্জিত হয়। (৪)

(১) আল-ওয়াফি বিল-ওয়াফায়াত (২/১১৯)।

(২) মুরুজুজ যাহাব (১/২৫৩)।

(৩) তাঁর তাফসীরে (২/৪৯০)।

(৪) তাফসীরে রাযী (৪/৩১২)।

৬. ইমাম যাহাবী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: আকাশের মাঝখানে পৃথিবী ঠিক যেন একটি তরমুজের অভ্যন্তরে থাকা আরেকটি তরমুজ। আকাশ একে সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। মহাবিশ্বের নিম্নতম স্থান হলো পৃথিবীর গোলকের অভ্যন্তরভাগ, যা কেন্দ্রবিন্দু। আর এটিই হলো নিম্নতার শেষ সীমা।

এই কেন্দ্রের নিচে যা আছে তাকে ‘নিচে’ বলা হয় না, বরং তা ‘উপরে’ হিসেবে গণ্য হয়; এমনকি যদি আমরা কল্পনা করি যে মহাবিশ্বের কেন্দ্র—যা পৃথিবীর সর্বনিম্ন স্থান—তা ছিদ্র করে অন্য পাশে যাওয়া হচ্ছে, তবে সেই ছিদ্রটি ‘উপরের’ দিকেই হবে। আর যদি সেই ছিদ্রটি অন্য দিকের আকাশ পর্যন্ত পৌঁছে যায়, তবে তা ‘উপরের’ দিকেই আরোহণ করবে। এর প্রমাণ হলো—যদি আমরা এমন একজন ভ্রমণকারীর কথা কল্পনা করি যে পৃথিবীর গোলকের উপর পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে যাত্রা করেছে এবং তার ভ্রমণ দীর্ঘায়িত করেছে, তবে সে গোলকের ওপর দিয়ে চলতে চলতে ঠিক সেখানেই ফিরে আসবে যেখান থেকে সে যাত্রা শুরু করেছিল। সে গোলকটিকে এমনভাবে অতিক্রম করবে যা একজন দর্শক তার নিজের নিচে দেখতে পায়; অথচ সে তার এই সফরে জমিন তার নিচে এবং আসমান তার উপরে থাকে। সুতরাং যে আসমানকে ইন্দ্রিয় জমিনের নিচে প্রত্যক্ষ করে, তা মূলত জমিনের উপরেই, নিচে নয়; কারণ আসমান সত্তাগতভাবেই জমিনের উপরে। (১)

৭. আল-কালকাশান্দী বলেন: পৃথিবীর গোলককে মাঝখানের একটি রেখা দুই ভাগে বিভক্ত করে: একটি দক্ষিণ গোলার্ধ এবং অন্যটি উত্তর গোলার্ধ। এই রেখাকে বিষুবরেখা বলা হয়, কারণ বছরের সকল ঋতুতে এর নিকট রাত ও দিন সমান হয়। এই রেখাকে অন্য একটি রেখা আড়াআড়িভাবে ছেদ করে একে পুনরায় দুই ভাগে বিভক্ত করে: একটি পূর্ব গোলার্ধ এবং অন্যটি পশ্চিম গোলার্ধ। এর মাধ্যমে এটি চারটি ভাগে বিভক্ত হয়। (২)

৮. ইমাম আল-গাজালী বলেন: বুদ্ধি এমন সব প্রমাণের মাধ্যমে অবগত হয়েছে—যেগুলোর ব্যাপারে ইন্দ্রিয় কোনো বিতর্ক করতে সক্ষম নয়—যে

সূর্যের চাকতি পৃথিবীর গোলকের তুলনায় বহুগুণ বড়। (৩)

তিনি আরও বলেন: পৃথিবীর গোলকের দুটি বিপরীত বিন্দুতে দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের পায়ের তলদেশ একে অপরের মুখোমুখি থাকে, আর আমরা আবশ্যিকভাবেই তা জানি। (৪)

৯. ইবুনে আল-নাফিসের নিকট পৃথিবীর গোলকত্বের কারণে দূরবর্তী বস্তু দেখতে না পাওয়ার কারণের ব্যাখ্যা: ইবনে আল-নাফিস বলেন: চোখ উঁচুতে থাকুক বা নিচুতে—এটি ঘটে থাকে। তবে উঁচু চোখ অনুচ্চ চোখের তুলনায় বেশি দেখতে পায়। এর কারণ চোখের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়া বা তার উপলব্ধির ক্ষমতা বেড়ে যাওয়া নয়, বরং পৃথিবীর গোলকাকৃতি গঠন। সুতরাং পৃথিবীর উপরিভাগে থাকা অত্যন্ত দূরবর্তী বস্তু পৃথিবীর উত্তলতার কারণে দৃষ্টি থেকে আড়ালে চলে যায়। (৫)

(১) মুখতাসারুল উলু (পৃষ্ঠা ৭৩)।

(২) সুবহুল আশা (১/৪০৮)।

(৩) মেয়ারুল ইলম (পৃষ্ঠা ২)।

(৪) মেয়ারুল ইলম (পৃষ্ঠা ৫১)।

(৫) শারহু কিতাবি তাশরিহি কানুন ইবনে সিনা (পৃষ্ঠা ১১২)।

১০. আর-রাজী বর্ণনা করেন যে, চন্দ্রগ্রহণ পৃথিবীর গোলকত্বের প্রমাণ। তিনি বলেন: যখন চন্দ্রগ্রহণ হয়, তখন যদি আমরা সুদূর প্রাচ্যের বাসিন্দাদের এর শুরু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করি, তবে তারা বলবে: এটি রাতের শুরুতে হয়েছে। আর যদি আমরা সুদূর পাশ্চাত্যের বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসা করি, তবে তারা বলবে: এটি রাতের শেষভাগে হয়েছে। এতে আমরা জানতে পারলাম যে, সুদূর প্রাচ্যের রাতের শুরুটাই হলো সুদূর পাশ্চাত্যের রাতের শেষভাগ; আর

তা পৃথিবী গোলাকার হওয়া অবধারিত করে। (১)

(১) বায়ান তালবিসুল জাহমিয়্যাহ ফি তাসিস বিদা'ইহিমুল কালামিয়্যাহ, ইবনে তাইমিয়্যাহ, ২/১৯৬; আরশের ওপর উঠা (ইস্তিওয়া) সংক্রান্ত আলোচনার বর্ণনা: আর-রাযীর পঞ্চম প্রমাণের অনুচ্ছেদ।

তৃতীয় দিক: জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মুহাম্মদ (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বেই পৃথিবী গোলাকার হওয়ার প্রমাণ দিয়েছিলেন—এই সংশয়ের উত্তরে আমরা বলব: আকাশ থেকে অবতীর্ণ ওহী অথবা বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির মাধ্যমে আবিষ্কার ব্যতিরেকে প্রকৃতপক্ষে পৃথিবী যে গোলাকার, তা কারো নিশ্চিতভাবে জানা ছিল না। এ ছাড়া যা কিছু ছিল, তা ছিল নিছক ধারণা মাত্র, যা নিশ্চিত জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল ছিল না।

১. মহাকাশে ভাসমান অবস্থায় পৃথিবীর গোলাকার আকৃতি মানুষের সামনে স্পষ্ট হয়নি যতক্ষণ না রুশরা ১৯৫৭ সালের অক্টোবরে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুটনিক) উৎক্ষেপণ করে। বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম উপগ্রহে স্থাপিত ক্যামেরার মাধ্যমে পৃথিবী গ্রহের স্পষ্ট ছবি পেতে সক্ষম হন। ১৯৬৬ সালে কৃত্রিম উপগ্রহ (লুনিক-৯) তার উন্নত যন্ত্রপাতিসহ চাঁদের পৃষ্ঠে অবতরণ করে এবং পৃথিবীতে অবস্থিত রিসিভিং স্টেশনগুলোতে পৃথিবী গ্রহের ছবি পাঠায়। এমতাবস্থায় মুহাম্মদ (সা.) তা কীভাবে জানলেন? নিশ্চয়ই এটি হলো ঐশী ওহী, যা প্রমাণ করে যে, যিনি কুরআন অবতীর্ণ করেছেন তিনি মহাবিশ্বের স্রষ্টা এবং তিনি সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (১)

চতুর্থ দিক: তাদের এই কথার উত্তর যে, যায়েদ বিন আমর পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন।

ইবনে ইসহাক বলেন: যায়িদ বিন আমর ইবনে নুফাইল বলেছেন: "আমি

আমার চেহারা তাঁর প্রতি সমর্পণ করেছি, যাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে সেই পৃথিবী, যা ভারী পাথরসমূহ বহন করে। তিনি একে বিস্তৃত (দাহাহা) করেছেন, অতঃপর যখন তিনি দেখলেন এটি পানির ওপর সুস্থিত হয়েছে, তখন তিনি এর ওপর পাহাড়সমূহ গেঁথে দিলেন। আমি আমার চেহারা তাঁর প্রতি সমর্পণ করেছি, যাঁর প্রতি আত্মসমর্পণ করেছে সেই মেঘমালা, যা সুপেয় নির্মল পানি বহন করে।" (২)

(১) আল-ইসলাম ওয়াল হাকাইকুল ইলমিয়্যাহ, মাহমুদ আল-কাসিম; এবং আল-ইজাজুল ইলমি ফিল কুরআনিল কারীম, হাসান আবু আল-আইনাইন।
(২) সিরাতে ইবনে হিশাম (১/২২৯)।

প্রথমত: যায়িদ বিন আমর ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বীনের অনুসারী ছিলেন:

এমতাবস্থায় বাধা কোথায় যে তিনি এটি বিভিন্ন কিতাবে প্রাপ্ত নিদর্শন থেকে কিংবা মানুষের কাছে সংরক্ষিত বাণীসমূহ থেকে গ্রহণ করেছেন? এমনকি যদি ইবরাহিম (আ.)-এর দ্বীনের শিক্ষা না-ও হতো, তৎকালীন সময়ে এটি প্রচলিত ছিল না, যার ফলে এদের কিছু অংশ বা সামান্য কিছু মানুষের মুখে মুখে উচ্চারিত হওয়া থেকে বাধাগ্রস্ত হয়নি। ইবনে ইসহাক বলেন: আল-খাত্তাব ইবনে নুফায়েল—যিনি যায়েদ ইবনে আমরের চাচা এবং তার বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন—তাকে তিরস্কার করতেন এবং কষ্ট দিতেন। এমনকি তিনি তাকে মক্কার উচ্চভূমি থেকে বের করে দিয়েছিলেন। এরপর তিনি মক্কার বিপরীতে হেরা পর্বতের পাদদেশে অবস্থান করতেন। যখনই তিনি গোপনে মক্কায় প্রবেশ করতেন, তখনই তারা তাকে কষ্ট দিয়ে বের করে দিত; তারা অপছন্দ করত যে তিনি তাদের ধর্ম নষ্ট করে দেবেন অথবা কেউ তাকে

অনুসরণ করবে। এরপর তিনি ইবরাহিম (আ:)-এর ধর্ম অনুসন্ধানে বের হলেন এবং শাম ও জাযিরা অঞ্চল ভ্রমণ করলেন। (১)

দ্বিতীয়ত: জায়েদ বিন আমর ইহুদি ও নাসারাদের থেকে কোনো কিছু গ্রহণ করেননি, কেননা তিনি তাদের প্রতি ঘৃণা পোষণ করতেন:

ইবনে উমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) থেকে বর্ণিত যে, জায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল দ্বীনের সন্ধানে শামের উদ্দেশ্যে বের হলেন এবং এক ইহুদি পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি তাকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন এবং বললেন: 'আমি হয়তো আপনাদের ধর্ম গ্রহণ করব, তাই আমাকে এ সম্পর্কে অবগত করুন।' তিনি বললেন: 'আপনি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রাপ্য ক্রোধের অংশ গ্রহণ করবেন।' জায়েদ বললেন: 'আমি তো আল্লাহর ক্রোধ থেকেই পলায়ন করছি এবং আমি কখনোই আল্লাহর সামান্যতম ক্রোধও বহন করতে পারব না; আর আমি কি তা বহন করতে সক্ষম? তবে আপনি কি আমাকে অন্য কোনো ধর্মের পথ দেখাতে পারেন?' তিনি বললেন: 'আমি একনিষ্ঠ (হানিফ) ধর্ম ছাড়া আর কিছু জানি না।' জায়েদ জিজ্ঞেস করলেন: 'হানিফ ধর্ম কী?' তিনি বললেন: 'তা ইবরাহিমের ধর্ম; তিনি ইহুদি বা নাসারা ছিলেন না এবং তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করতেন না।' এরপর জায়েদ সেখান থেকে প্রস্থান করলেন এবং এক নাসারা পণ্ডিতের সাক্ষাৎ পেয়ে অনুরূপ কথা বললেন। তিনি বললেন: 'আপনি আমাদের ধর্ম গ্রহণ করতে পারবেন না যতক্ষণ না আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার প্রাপ্য অভিশাপের অংশ গ্রহণ করবেন।' জায়েদ বললেন: 'আমি তো আল্লাহর অভিশাপ থেকেই পলায়ন করছি এবং আমি কখনোই আল্লাহর অভিশাপ বা তাঁর ক্রোধের

সামান্যতম অংশও বহন করতে সক্ষম নই। তবে আপনি কি আমাকে অন্য কোনো ধর্মের পথ দেখাতে পারেন?' তিনি বললেন: 'আমি একনিষ্ঠ (হানিফ) ধর্ম ছাড়া আর কিছু জানি না।' জায়েদ জিজ্ঞেস করলেন: 'হানিফ ধর্ম কী?' তিনি বললেন: 'তা ইবরাহিমের ধর্ম; তিনি ইহুদি বা নাসারা ছিলেন না এবং তিনি আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করতেন না।' যখন তিনি তাদের বক্তব্যকে ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম)-এর ধর্মের ব্যাপারে অভিন্ন দেখলেন, তখন তিনি সেখান থেকে বেরিয়ে এলেন এবং উন্মুক্ত স্থানে এসে উভয় হাত তুলে বললেন: 'হে আল্লাহ! আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি ইবরাহিমের ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত।' (২)

(১) তারিখুল ইসলাম লিয যাহাবি (১/১৮), যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েল।
(২) ইমাম বুখারি এটি বর্ণনা করেছেন (৩৮২৭)।

তৃতীয়ত: যায়েদ বিন আমরের সাথে নবী (সা.) এর সাক্ষাৎ:

যায়েদ বিন হারিসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: আমি মক্কার উত্তপ্ত দিনগুলোর একটিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বের হলাম। আমাদের সাথে যায়েদ বিন আমর বিন নুফায়েলের সাক্ষাৎ হলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন: 'হে যায়েদ, কী হয়েছে যে আমি দেখছি তোমার কওম তোমাকে ঘৃণা করছে?' যায়েদ বললেন: 'আল্লাহর কসম হে মুহাম্মদ! তাদের সাথে আমার কোনো ব্যক্তিগত বিরোধ নেই, বরং আমি এই দ্বীনের সন্ধানে বের হয়েছি। পরিশেষে আমি ফাদাকের ইহুদি আলেমদের নিকট উপস্থিত হলাম এবং তাদের পেলাম যে তারা আল্লাহর ইবাদত করে এবং তাঁর সাথে শিরক করে।' তিনি বললেন: 'আমি বললাম: তবে এটি কোন দ্বীন যা আমি অন্বেষণ করছিলাম! অতঃপর

আমি বের হলাম যতক্ষণ না শামের (সিরিয়া) ইহুদি পণ্ডিতদের নিকট উপনীত হলাম। আমি তাদের আল্লাহর ইবাদত করতে দেখলাম কিন্তু তারা তাঁর সাথে শিরক করত। আমি বললাম: আমি যে দ্বীন অনুসন্ধান করছি এটি তা নয়। তখন তাদের একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি বললেন: তুমি এমন এক দ্বীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ যা পালন করে আল্লাহকে ইবাদত করে এমন কাউকে আমরা চিনি না, কেবল হীরা অঞ্চলের জনৈক বৃদ্ধ ব্যতীত। বর্ণনাকারী বলেন: অতঃপর আমি বের হলাম যতক্ষণ না তার নিকট পৌঁছলাম। যখন তিনি আমাকে দেখলেন, বললেন: তুমি কোথা থেকে এসেছ? আমি বললাম: আমি আল্লাহর ঘরের (মক্কা) অধিবাসী। তিনি বললেন: তুমি যে দ্বীনটি খুঁজছ তা তো তোমার এলাকাতেই প্রকাশিত হয়েছে; একজন নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং তাঁর নক্ষত্র উদিত হয়েছে। আর যাদের তুমি দেখেছ তারা সবাই পথভ্রষ্ট। হে মুহাম্মদ! এরপর আমি আর কিছু অনুভব করিনি। তিনি বলেন: তাঁর সামনে দস্তরখান পেশ করা হলো। যায়েদ ইবনে হারিসাহ (রা.) বলেন: অতঃপর নবী বায়তুল্লাহতে আসলেন। বর্ণনাকারী বলেন: আমরা পৃথক হলাম এবং তিনি বায়তুল্লাহ তওয়াফ করলেন, আমি তাঁর সঙ্গেই ছিলাম। সাফা ও মারওয়াতেও (তওয়াফ করলেন)। তিনি বলেন: সাফা ও মারওয়ার নিকট তামা নির্মিত দুটি মূর্তি ছিল; তাদের একটির নাম ছিল 'ইসাফ' এবং অন্যটির নাম 'নাইলা'। মুশরিকরা যখন তওয়াফ করত তখন তারা সেগুলোকে স্পর্শ করত। তখন নবী বললেন: "তুমি সেগুলোকে স্পর্শ করো না, কারণ সেগুলো অপবিত্র।" আমি মনে মনে বললাম: আমি অবশ্যই সেগুলোকে স্পর্শ করব যাতে দেখতে পারি নবী কী বলেন। অতঃপর আমি সেগুলো স্পর্শ করলাম। তিনি বললেন: "হে যায়েদ! তোমাকে কি নিষেধ করা হয়নি?" তিনি বলেন: অতঃপর যায়েদ ইবনে আমর মারা গেলেন এবং নবীর নিকট ওহী অবতীর্ণ

হলো। তখন নবী যায়েদ (ইবন আমর) সম্পর্কে বললেন: "তাকে (কিয়ামতের দিন) একাকী একটি উম্মত হিসেবে পুনরুত্থিত করা হবে।" (১)

(১) নাসাঈ আল-কুবরা গ্রন্থে (৮১৮৮), বাজ্জার (১৬৫/৪, হাদিস: ১৩৩১), আবু ইয়ালা (১৭০/১৩, হাদিস: ৭২১২), তাবারানি (৮৬/৫, হাদিস: ৪৬৬৩), হাকেম (২৩৮/৩, হাদিস: ৪৯৫৬), ইবনে আবি আসিম 'আল-আহাদ ওয়াল মাসানি' গ্রন্থে (১৯৯/১, হাদিস: ২৫৭), এবং আল-মাতালিব আল-আলিয়াহ গ্রন্থে (৪৫৭)। আল-হাইসামি বলেন (মাজমাউয যাওয়াইদ, ৯/৬৯৫): আবু ইয়ালা, বাজ্জার ও তাবারানির বর্ণনাকারীগণ সহীহ হাদিসের বর্ণনাকারী, কেবল মুহাম্মদ ইবনে আলকামা ব্যতীত, আর তিনি হাসান পর্যায়ের।

আমি বলছি:

১. এটি প্রমাণ করে যে, নবী যায়েদ ইবনে আমরের ছাত্র ছিলেন না। বরং তাদের মাঝে স্রেফ কিছু কথোপকথন হয়েছিল। যায়েদ নবীকে তাওহীদ শিক্ষা দেননি। বরং আল্লাহর রাসূল সৃষ্টির শুরু থেকেই একত্ববাদী ছিলেন এবং কখনো আল্লাহর সাথে বিন্দুমাত্র শিরক করেননি। নবী কখনো শিরকে লিপ্ত ছিলেন এবং পরে যায়েদ এসে তাঁকে তাওহীদ শিখিয়েছেন আর নবী তাঁর জ্ঞান থেকে তা শিখেছেন—এমন কোনো প্রমাণ নেই।

২. এমনকি যদি এটি প্রমাণিতও হয় যে, যায়েদ ইবনে আমর বলেছিলেন আল্লাহ জমিন বিস্তৃত করেছেন, তবে এটি আবশ্যক করে না যে নবী তাঁর নিকট থেকে তা শিখেছেন। উভয়েই মুওয়াহহিদ হওয়ার ব্যাপারে একমত ছিলেন, তবে এর অর্থ এই নয় যে একজন অন্যজন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। একইভাবে তারা এই বক্তব্যেও একমত হয়েছেন যে, আল্লাহ জমিনকে বিছিয়েছেন, যদিও কেউ অন্যজন থেকে এই বক্তব্যটি নকল করেননি।

৩. নবী (সা.) আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে জমিন সম্পর্কে অনেক বিষয় নিয়ে এসেছেন, যা কেবল এই বক্তব্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় যে, আল্লাহ জমিনকে বিছিয়েছেন। যদি দাবিদাররা দাবি করে যে, জমিনকে বিছানোর বিষয়টি যায়িদ বিন আমরের বক্তব্য থেকে নেওয়া হয়েছে, তবে আমরা তাদের বলব: নবী (সা.) জমিন সম্পর্কে অবশিষ্ট অন্যান্য বক্তব্য ও সংবাদগুলো কোথা থেকে পেলেন যা সামনে উল্লেখ করা হবে?

চতুর্থত: উস্তাদ মুহাম্মদ রাশিদ রিদা বলেছেন:

যায়িদ বিন আমর নির্যাতিত ছিলেন এবং হেরা গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাথে তার এমন কোনো বৈঠক হয়নি যার ভিত্তিতে বলা যায় যে, তিনি তাঁর সাথে দ্বীনের মাসআলাগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং তাঁর মনে কোনো গভীর প্রভাব ফেলেছেন, অথবা তিনি তাঁর কাছ থেকে ধারণাটি গ্রহণ করেছেন; কারণ বিষয়টি কোনো ধারণা ধার করার বিষয় নয়। কেননা কুরআন এবং এতে যা কিছু আছে—যেমন অলৌকিক বাগ্মিতা ও প্রাঞ্জলতা, প্রজ্ঞাপূর্ণ বাণীসমূহ, সুদৃঢ় উপমাসমূহ, অতীত নবী ও জাতিসমূহের অবস্থা বর্ণনা, ভবিষ্যতের সংবাদসমূহ, স্রষ্টার সাথে মানুষের সম্পর্ক এবং অন্যদের সাথে মানুষের সম্পর্কের বর্ণনা, আর মহান আইনবিধান যা মুজতাহিদ ইমাম ও প্রথিতযশা আলেমদের গবেষণার বিষয়ে পরিণত হয়েছে—তার উৎস হেরা গুহায় বা পথে আকস্মিকভাবে যায়িদ বিন আমরের সাথে রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর সাক্ষাৎ হতে পারে না। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ইতিহাস থেকে আমরা জানি না যে তিনি কোনো পুরুষদের সাথে আলোচনা করতেন অথবা তারা তাঁকে ছোটবেলা থেকে নবী হওয়া পর্যন্ত শিক্ষা দিতেন; বরং প্রমাণিত সত্য এই যে, তিনি নিরক্ষর ছিলেন,

তিনি জানতেন না লিখন বা পঠন কী, এমনকি জানতেন না দ্বীন বা এর মূলনীতিসমূহ কী, যতক্ষণ না তাঁর প্রতি ওহী অবতীর্ণ হয়েছে। এছাড়া নবী (সা.)-এর রিসালাত কেবল আরব জাতির জন্য সীমাবদ্ধ ছিল না, যেমনটি ‘সল’ ও তার সমমনারা মনে করত; বরং কুরআনের অকাট্য ভাষ্য অনুযায়ী তাঁর রিসালাত ছিল বিশ্বজনীন। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আমি আপনাকে সমগ্র মানবজাতির জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবেই প্রেরণ করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।" (সুরা সাবা: ২৮)। (১)

(১) তাঁর রচিত ‘সায়্যিদুনা মুহাম্মদ (সা.)’ গ্রন্থে (১/৭৭)

পঞ্চমত: ‘দাহাহা’ শব্দটি তিনি তাঁর কবিতায় যে অর্থে ব্যবহার করেছেন, তার অর্থ তা নয় যা সেই ব্যক্তি উদ্দেশ্য করেছেন যিনি জমিন গোলাকার হওয়ার কথা বলেছেন। যায়িদ বিন আমর ‘দাহাহা’ বলতে ‘একে সমান করেছেন’ বুঝিয়েছেন, আর এই অর্থটি জমিন গোলাকার হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করে না স্পষ্টভাবে, এবং যারা বলেন যে পৃথিবী গোলাকার, তারা 'দাহা-হা' দ্বারা উদ্দেশ্য করেন যে: তিনি একে বিছিয়ে দিয়েছেন, প্রসারিত করেছেন।

আলূসী বলেন: (দাহা-হা), প্রথমত: এর অর্থ হলো একে বিছিয়ে দেওয়া এবং এর অধিবাসীদের বসবাস ও এর বিভিন্ন প্রান্তে তাদের চলাচলের জন্য একে প্রসারিত করা। এটি 'দাহওয়া' অথবা 'দাহয়ি' শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ বিস্তার করা। উমাইয়্যা বিন আবিস সালত-এর এই কবিতাটি এই অর্থের ওপর ভিত্তি করে: তিনি তাতে সৃষ্টিজগতকে ছড়িয়ে দিলেন যখন তিনি একে প্রসারিত করলেন, অতঃপর তারা কিয়ামত পর্যন্ত এর অধিবাসী।

দ্বিতীয়ত: বলা হয়েছে: 'দাহা-হা' অর্থ তিনি একে সুবিন্যস্ত করেছেন। তারা

যায়িদ বিন আমর বিন নুফাইলের এই কবিতাটি পাঠ করেন:

আমি আমার চেহারা তাঁর কাছে সমর্পণ করলাম যাঁর কাছে পৃথিবী আত্মসমর্পণ করেছে, যা ভারী পাথরসমূহ বহন করে। তিনি একে প্রসারিত করেছেন, অতঃপর যখন এটি সমতল হলো তখন তিনি একে আল্লাহর হাতসমূহ দ্বারা মজবুত করেছেন, এবং এর ওপর পাহাড়সমূহকে দৃঢ়ভাবে স্থাপন করেছেন।

অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ প্রথম মতের ওপর রয়েছেন, এবং প্রকাশ্য বিষয় হলো যে, পৃথিবীর প্রসারণ একে সৃষ্টি করার পরেই হয়েছে। (১)

আমি (গ্রন্থকার) বলি: উমাইয়্যার বক্তব্যের অর্থ কুরআনে যা এসেছে তার সাথে সংগতিপূর্ণ। এটি সম্ভব যে উমাইয়্যা এই অর্থ কুরআন থেকে গ্রহণ করেছেন, কারণ তাঁর মৃত্যু নবী (সা.) এর ইন্তেকালের কাছাকাছি সময়ে ছিল।

ইবনে হাজার 'উমাইয়্যা বিন আবিস সালত' এর জীবনীতে বলেন: এটি সুপরিচিত যে তিনি হিজরীর নবম বর্ষে মৃত্যুবরণ করেন। ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে দ্বিমত পোষণ করেননি যে তিনি কাফের অবস্থায় মারা গেছেন। এটি প্রমাণিত যে তিনি বদর যুদ্ধের নিহতদের জন্য শোকগাথা রচনা করা পর্যন্ত বেঁচে ছিলেন। বুখারীতে আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত মারফূ হাদীসে এসেছে: "উমাইয়্যা বিন আবিস সালত প্রায় ইসলাম গ্রহণ করে ফেলেছিলেন।" (২)

(১) রূহুল মাআনী (২২/১৪৭; আন-নাযিয়াত: ৩০)

(২) আল-ইসাবাহ (১/২৫০) উমাইয়্যার জীবনী অংশে।

ষষ্ঠত: এমনকি যদি এই পঙক্তিটি যায়েদ বিন আমরের দিকে সম্বন্ধ করা সঠিকও হয়, এবং এমনকি যদি তিনি পৃথিবী গোলাকার হওয়া উদ্দেশ্য করে থাকেন, তবুও আরবদের মাঝে, বরং খ্রিস্টান ও ইহুদিদের মাঝেও—যাদের

থেকে আপনারা দাবি করেন যে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন গ্রহণ করেছেন—এটিই প্রসিদ্ধ ছিল যে পৃথিবী সমতল এবং তা গোলাকার নয়; কারণ তাদের নিকট খালি চোখে এটিই দৃশ্যমান ছিল। একইভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা তাদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থসমূহ থেকে এটিই বুঝেছিল, এমনকি চার্চ একটি সময়কালে প্রত্যেক ব্যক্তিকে সতর্ক ও সাবধান করেছিল 'যে বলত: পৃথিবী গোলাকার।

১. তাই আমরা বলি: মুহাম্মাদ (সা.)-এর জন্য এটিই স্বাভাবিক ছিল যে তিনি এই ধারণা গ্রহণ করবেন যে পৃথিবী সম্পূর্ণ সমতল, গোলাকার নয়। সুতরাং যখন তিনি তাঁর সমসাময়িক প্রসিদ্ধ মতের বিরোধিতা করলেন, তখন তা এই কথার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল যে তিনি আসমান থেকে অবতীর্ণ ওহী অনুসরণ করছেন এবং আহলে কিতাবরা যা বলে তা অনুকরণ করছেন না। এমনকি আমরা যদি বলি যে, তাঁর পূর্বেও কেউ কেউ পৃথিবী গোলাকার হওয়ার কথা বলেছিল, তবুও এই উক্তিটি আরব উপদ্বীপের অধিবাসীদের নিকট ছিল অত্যন্ত বিরল ও অপরিচিত।

২. এই কারণেই আমরা দেখি যে আরব মুশরিকরা কুরআনের মহাজাগতিক নিদর্শনসমূহ নিয়ে আপত্তি তুলত। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো তাদের এই আপত্তি যে, আল্লাহ কীভাবে তাঁর নবী মুহাম্মাদ (সা.)-কে পৃথিবী থেকে আকাশে আরোহণ করাতে সক্ষম হন এবং আল্লাহ কীভাবে মৃতদের জীবিত করতে পারেন। তারা চাইল চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হোক, আর তা তাদের চোখের সামনেই দ্বিখণ্ডিত হলো।

সপ্তমত: যায়েদ বিন আমর-এর কোনো কবিতার দেওয়ান ছিল না যেমনটি

আরব কবিদের ছিল।

১. সুতরাং যখন আমরা কোনো কবির কবিতার সত্যতা নিশ্চিত করতে চাই, তখন তাঁর কোনো মুয়াল্লাকা (ঝুলন্ত কবিতা) বা দেওয়ান থাকতে হবে, অথবা এমন কোনো গ্রন্থ থাকতে হবে যাতে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে, অথবা সাহিত্য বিশারদগণ সেই কবির কবিতার সত্যতা প্রমাণ করবেন, অথবা তাঁর কবিতা নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হতে হবে।

২. তাই ফিকহ বা ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে বর্ণিত কবিতার কতিপয় পঙক্তির মাধ্যমে জাহেলী যুগের কোনো প্রখ্যাত কবির কবিতার সত্যতা প্রমাণ করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় এবং সাহিত্যের কিতাবসমূহে তাঁর সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তাও আমরা বর্জন করতে পারি না।

৩. যায়েদ বিন আমরের দিকে সম্বন্ধযুক্ত এই কবিতার কোনো মুয়াল্লাকা নেই, কোনো দেওয়ান নেই বা এমন কোনো গ্রন্থও নেই যাতে তাঁর কবিতা সংকলিত হয়েছে। সাহিত্য বিশারদগণ তাঁদের গ্রন্থসমূহে এই কবিতার সত্যতা নিশ্চিত করেননি এবং এই কবিতাটি কোনো নিরবচ্ছিন্ন সনদে বর্ণিত হয়নি। এমনকি ইবনে ইসহাক, যিনি এই কবিতাটি তাঁর থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি স্বয়ং তাঁর থেকে এটি শোনেননি। ফলে তিনি এটি নিরবচ্ছিন্ন সনদে তাঁর থেকে বর্ণনা করেননি এবং ঐতিহাসিক গ্রন্থসমূহেও এই কবিতাটি মুতাওয়াতির (সুপ্রসিদ্ধ) বর্ণনা হিসেবে বর্ণিত হয়নি।

পঞ্চম দিক: কুরআনের সেই সকল আয়াত দ্বারা পৃথিবীর গোলত্বের প্রমাণ উপস্থাপন করা যা আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীর গোলত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট মনে না হলেও তা প্রমাণ হিসেবে গণ্য।

আর সেই আয়াতগুলোর মধ্যে রয়েছে মহান আল্লাহর বাণী: "তিনিই সেই সত্তা যিনি রাত ও দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন; প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।" (আল-আম্বিয়া: ৩৩)। এবং মহান আল্লাহ আরও বলেন: "সূর্যের পক্ষে সম্ভব নয় চন্দ্রের নাগাল পাওয়া, আর রাতের পক্ষে সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা। আর প্রত্যেকেই নিজ নিজ কক্ষপথে বিচরণ করছে।" (ইয়াসীন: ৪০)।

ইবনে আব্বাস (রা.) এবং সালাফদের মধ্য থেকে অন্যরা বলেছেন: "(তারা বিচরণ করে) চরকার টাকুর মতো একটি কক্ষপথে, যার চারপাশে চরকাটি আবর্তিত হয়।" (১)

ইবনে তাইমিয়া বলেন: এটি গোলাকার হওয়া ও আবর্তনের ব্যাপারে সুস্পষ্ট। এর মূল ভিত্তি হলো, ভাষাগতভাবে (আল-ফালক) মানে হলো গোলাকার বস্তু। বলা হয়ে থাকে: কিশোরীর স্তন 'তাফাল্লাকা' হয়েছে যখন তা গোলাকার হয়। আর সুতা কাটার টাকুর গোলাকার অংশকে তার গোলাকার হওয়ার কারণে 'ফালকা' বলা হয়। সুতরাং মুফাসসির ও ভাষাবিদগণ এই বিষয়ে একমত যে, (আল-ফালক) হলো গোলাকার বস্তু। আল্লাহর কিতাবের অর্থের জ্ঞান কেবল এই দুটি পথ থেকেই গ্রহণ করা যায়: সালাফদের মধ্য থেকে নির্ভরযোগ্য মুফাসসিরগণের নিকট থেকে এবং সেই ভাষা থেকে যে ভাষায় কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, আর তা হলো আরবদের ভাষা। (২)

(১) তাবারী এটি বর্ণনা করেছেন (৯/২২; আল-আম্বিয়া: ৩২), এবং ইবনে আবি হাতিম (১৪৫১৪), এবং আবুশ শাইখ 'আল-আজমাহ' গ্রন্থে।

(২) মাজমুউল ফাতাওয়া (৬/৫৮৭) এবং এর পরবর্তী অংশ।

ষষ্ঠ দিক: মহান আল্লাহর বাণী: "আর রাত দিনের অগ্রগামী হতে পারে না।" এটি পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ফায়দা প্রদান করে।

শাইখ শা'রাভী বলেন: এরপর আমরা মহান আল্লাহর এই বাণীর ওপর চিন্তা করি: "আর রাত দিনের অগ্রগামী হতে পারে না।" এই সম্মানিত আয়াতের অর্থ কী? এর অর্থ হলো: এটি তাদের যুগের একটি ধারণার খণ্ডন করছে যাতে তা তাদের জন্য সংশোধন করে দেওয়া যায়। তারা বলত: দিন রাতের আগে আসে; সূর্যোদয়ের মাধ্যমে দিন শুরু হয় এবং সূর্যাস্তের মাধ্যমে শেষ হয়, তারপর রাত আসে। অর্থাৎ দিন রাতের আগে আসে। তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এসে বললেন: "আর রাত দিনের অগ্রগামী হতে পারে না।" এখান থেকেই তিনি তাদের এই কথার প্রতিবাদ জানাচ্ছেন যে দিন রাতের অগ্রগামী। তিনি বলছেন: দিন রাতের আগে যায় না এবং রাতও দিনের আগে যায় না। এটি তাদের জন্য একটি ঘোষণা যে পৃথিবী গোলাকার এবং রাত ও দিন একই সময়ে এর পৃষ্ঠে বিদ্যমান থাকে। যদি পৃথিবী সমতল হতো, তবে বিষয়টি দুই অবস্থার বাইরে যেত না:

প্রথম অবস্থা: আল্লাহ সূর্যকে সমতল পৃথিবীর মুখোমুখি করে সৃষ্টি করেছেন। এই অবস্থায় প্রথমে দিন বিদ্যমান থাকত, তারপর আল্লাহ সূর্যকে ডুবিয়ে দিতেন এবং দ্বিতীয়ত রাত আসতো।

দ্বিতীয় অবস্থা: অথবা তিনি সূর্যকে পৃথিবীর পৃষ্ঠের মুখোমুখি না করে সৃষ্টি করেছেন। এই অবস্থায় প্রথমে রাত বিদ্যমান থাকত, তারপর ভূপৃষ্ঠে সূর্যের উদয় হতো এবং দিন আসত। বিষয়টি এই দুটি বিষয়ের বাইরে যাবে না।

সুতরাং আল্লাহ যখন কোনো বিষয়ের অবতারণা করেন এবং বলেন: **"আর**

রাত দিনকে অতিক্রমকারী নয়” অর্থাৎ তিনি সম্পূর্ণভাবে এটি অস্বীকার করছেন যে দিন রাতের আগে চলে যায় অথবা রাত দিনের আগে চলে যায়; যেহেতু তাদের একটি অপরটিকে অতিক্রম করে না। আর এটি কখন থেকে? পৃথিবীর সৃষ্টির সূচনা থেকে, অথবা যখন থেকে আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আয়তনের জগতে এটি কখনোই সম্ভব নয় যদি না পৃথিবী গোলাকার হয়। যখন আল্লাহ সূর্য ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তখন রাত ও দিন একসাথেই বিদ্যমান ছিল। পৃথিবীর যে অর্ধেক অংশ সূর্যের মুখোমুখি ছিল তা দিনে পরিণত হলো এবং অপর অর্ধেক অংশ রাতে পরিণত হলো। এরপর পৃথিবী ঘুরল, ফলে রাত দিনে এবং দিন রাতে রূপান্তরিত হলো এবং এভাবেই চলতে থাকল। অতএব, এই মহান আয়াত **“আর রাত দিনকে অতিক্রমকারী নয়”** আমাদের এই তথ্য প্রদান করে যে, পৃথিবী এই গোলাকার আকৃতিতেই সৃষ্টি করা হয়েছে। (১)

(১) তাঁর ‘মুজিজাতুল কুরআন’ গ্রন্থে (১/৪৮-৪৯)

সপ্তম দিক: মহান আল্লাহর বাণী: “তিনি রাতকে দিনের ওপর পেঁচিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের ওপর পেঁচিয়ে দেন” এটি পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার বিষয়টি নির্দেশ করে।

ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেছেন: ‘তাকভীর’ (তাকউইর) অর্থ হলো গোলাকার করা। বলা হয়: ‘আমি পাগড়ি পেঁচিয়েছি’ (কাউওয়ারতুল ইমামা), যখন আপনি তা গোলাকার করে পেঁচান। গোলাকার বস্তুকে ‘কারাহ’ বলা হয়, এর মূল হলো ‘কুরাহ’; এখানে ‘ওয়াও’ অক্ষরটি স্বরযুক্ত হয়েছে এবং তার পূর্ববর্তী অক্ষরটি ‘ফাতহা’ (যবর) যুক্ত হওয়ায় তা ‘আলিফ’-এ রূপান্তরিত

হয়েছে। একে ‘কুরাহ’-ও বলা হয়, এর মূলও ছিল ‘কুরাহ’; এখানে শব্দের মূলবর্ণের মধ্যাক্ষরটি বিলুপ্ত করা হয়েছে, যেমনটি ‘থুবাহ’ এবং ‘কুলাহ’ শব্দের ক্ষেত্রে বলা হয়। রাত, দিন এবং সময়ের অন্যান্য সকল অবস্থা গতির অনুগামী; কেননা সময় হলো গতির পরিমাপক, আর গতি গতিশীল বস্তুর ওপর নির্ভরশীল। সুতরাং যখন সময়—যা গতির অনুগামী এবং গতি বস্তুর অনুগামী—আবর্তনশীল বা গোলাকার হিসেবে বর্ণিত হয়, তখন বস্তুটি গোলাকার হওয়ার অধিক উপযোগী।

মহান আল্লাহ বলেছেন: “তুমি দয়াময় আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো অসঙ্গতি দেখতে পাবে না” (আল-মুলক: ৩)। আর আসমানে এমন কোনো বস্তু নেই যা সদৃশ বা সুষম নয় (অর্থাৎ নক্ষত্র ও গ্রহের মতো গোলাকার আকৃতির)। পক্ষান্তরে ত্রিভুজাকার, চতুর্ভুজাকার, পঞ্চভুজাকার, ষড়ভুজাকার এবং অন্যান্য আকৃতির ক্ষেত্রে কোণ ও বাহুর পার্থক্যের কারণে তাতে অসমতা ও বৈচিত্র্য থাকে; এতে কোনো দ্বিমত নেই এবং কোনো অসঙ্গতিও নেই। (১)

(১) ‘মাজমুউল ফাতাওয়া’ গ্রন্থে (৬/৫৮৭) এবং পরবর্তী অংশগুলোতে।

ইবনে হাজম বলেছেন: এটি একটির ওপর অন্যটি পেঁচিয়ে দেওয়ার সবচেয়ে স্পষ্ট বর্ণনা, যা পাগড়ির প্যাঁচ থেকে নেওয়া হয়েছে। এটি হলো তার আবর্তন এবং এটি পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার ব্যাপারে একটি অকাট্য পাঠ। (১)

ইউসুফ আল-হাজ আহমদ বলেছেন: আল্লাহ রাতকে দিনের ওপর পেঁচিয়ে দেন ফলে তা দিনকে ঢেকে ফেলে, এবং দিনকে রাতের ওপর পেঁচিয়ে দেন ফলে তা রাতকে ঢেকে ফেলে। এই দুইয়ের একে অপরের ওপর পেঁচিয়ে যাওয়ার মাঝে আমরা একটি গোলাকার পিণ্ড দেখতে পাই যা উভয়ের মাঝে

আবর্তিত হয় এবং তাদের একত্র করে, যাতে তারা একে অপরের ওপর অবস্থান করে। এই পিণ্ডটিই হলো পৃথিবী। আমরা যদি কল্পনা করি যে আমরা দিনের এলাকায় আছি, তবে কয়েক ঘণ্টা পর রাত সেই এলাকাকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। কিন্তু এটি সাধারণ উপায়ে আচ্ছন্ন করে না, বরং একে গোলাকারভাবে পেঁচিয়ে ধরে; অর্থাৎ, তা গোলাকারভাবে বাঁক নেয়। আর এটি স্বতঃসিদ্ধ যে, কথাটি বোঝার জন্য উক্ত এলাকাটিকে অবশ্যই গোলাকার হতে হবে। তৎকালীন মানবজাতি প্রচলিত কিছু রূপকথা ছাড়া এই সত্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল! তবে মুহাম্মদ (সা.) কীভাবে এটি জানলেন এবং এটি সাব্যস্ত করলেন?

সম্মানিত আয়াতটি স্পষ্ট করে দিচ্ছে যে, রাত ও দিনকে গোলাকার আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু রাত ও দিন পৃথিবীর পৃষ্ঠে একসাথেই বিদ্যমান থাকে, তাই তারা গোলাকার আকৃতিতে থাকা সম্ভব নয় যতক্ষণ না পৃথিবী নিজেই গোলাকার হয়। কারণ, দিন যে এলাকাকে ঢেকে রাখে তার আয়তন যদি রাত যে এলাকাকে ঢেকে রাখে তার আয়তনের সমান না হতো, তবে তারা একসাথে মিলে কোনো গোলকের আকৃতি গঠন করত না; বরং তাদের মধ্যবর্তী সূক্ষ্ম বিভাজন রেখাটি পৃথিবী পৃষ্ঠের আয়তন অনুযায়ী অন্য কোনো জ্যামিতিক আকৃতির হতো। আর এখানেই রয়েছে সেই অলৌকিক ও নির্ভুল প্রকাশভঙ্গি: **"তিনি রাতকে দিনের ওপর পেঁচিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের ওপর পেঁচিয়ে দেন।"** অর্থাৎ পৃথিবীর গোলার্ধের অর্ধেক অংশ দিন এবং বাকি অর্ধেক অংশ রাত। (২)

(১) আল-ফাসল (২/৭৮ পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার আলোচনার পরিচ্ছেদ)।

(২) 'মাওসুআতুল ইজাজিল ইলমি' (পৃ. ২৩০-২৩৩)।

শা'রাভী বলেছেন: এরপর আমরা মহান আল্লাহর বাণীর দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করি: "তিনি রাতকে দিনের ওপর পেঁচিয়ে দেন।" মহান আল্লাহ কেন 'পেঁচিয়ে দেওয়া' (ইউকাউয়িরু) শব্দটি ব্যবহার করেছেন? আল্লাহ কেন এই 'ইউকাউয়িরু' শব্দটি প্রয়োগ করেছেন? যদি পৃথিবী সমতল হতো তবে তিনি কেন বললেন না যে তিনি রাত ও দিনকে প্রসারিত করেন? অথবা রাত ও দিন ব্যতিরেকে অন্য কোনো শব্দ... বা অন্য কোনো শব্দ কেন ব্যবহার করলেন না? আপনি যদি কোনো কিছু নিয়ে একটি বলের চারদিকে পেঁচিয়ে দেন তবে আপনি বলবেন: আপনি এই কাপড়টিকে পেঁচিয়েছেন, অর্থাৎ আপনি সেটিকে সেই গোলকের আকার প্রদান করেছেন যার চারপাশে তাকে পেঁচানো হয়েছে। আর আপনি যদি কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে কোনো বস্তু গোলক আকারে তৈরি করে নিতে চান তবে তাকে বলবেন: এটি নাও এবং এটিকে গোলাকার করো; অর্থাৎ একে একটি গোলকের আকৃতি দাও। আল্লাহ তাআলার বাণী: "তিনি রাতকে দিনের উপর পেঁচিয়ে দেন"-এর অর্থ হলো: তিনি এই উভয়কে এমনভাবে স্থাপন করেছেন যা পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে রাখে। কুরআনের একটি অলৌকিকত্ব হলো, রাত ও দিন প্রতিটি মুহূর্তেই পৃথিবীর চারদিকে গোলাকারভাবে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ আল্লাহ এটা বলেননি যে: তিনি রাতকে পেঁচান অতঃপর দিনকে পেঁচান, বরং তিনি বলেছেন: তিনি রাতকে দিনের উপর পেঁচিয়ে দেন। এখানে 'উপর' (আলা) শব্দটির ব্যবহার পৃথিবীর গোলত্বের সাথে এর সামঞ্জস্যের গভীরতা অনুধাবনের জন্য বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। তিনি 'রাত ও দিনকে গোলাকার করেন' বলেননি, এর অর্থ হলো তারা একই সাথে পৃথিবীর চারদিকে বিদ্যমান। কুরআন চৌদ্দশ বছর আগে এই সংবাদ দিয়েছে, যা অতি সাম্প্রতিক সময়ের আগে মানবজ্ঞানের নাগালে আসেনি। পৃথিবীর

গোলত্বের বিষয়টি কুরআন একাধিক স্থানে স্পর্শ করেছে। কেন? কারণ এটি একটি বড় মহাজাগতিক সত্য। (১)

(১) মুজিজাতুল কুরআন (১/৪৮-৪৯)।

তিনি আরও বলেন:

১. এভাবে সত্যময় সত্তা সুবহানাহু ওয়া তাআলা বর্ণনা করছেন যে, রাত ও দিন গোলাকার আকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেহেতু রাত ও দিন পৃথিবীর উপরিভাগে একই সাথে বিদ্যমান থাকে, তাই তারা গোলাকার আকৃতিতে থাকা তখনই সম্ভব যখন পৃথিবী নিজেই গোল হবে, যাতে গোলকের এক অর্ধাংশ অন্ধকার এবং অপর অর্ধাংশ আলোকিত থাকে। এটি কুরআনের আরেকটি সত্য যা আমাদের জানায় যে, পৃথিবীর এক অর্ধাংশ আলোকিত এবং অপর অর্ধাংশ অন্ধকার থাকে। যদি রাত ও দিন ভূপৃষ্ঠে অসম আয়তনে বিদ্যমান থাকতো, যেখানে একটি সরু ফিতার মতো মনে হতো আর অন্যটি অধিকাংশ এলাকা জুড়ে থাকতো, তবে তারা একত্রে গোলক আকৃতির হতো না। কারণ সেই সরু ফিতাটি তখন আয়তাকার, ত্রিভুজাকার বা বর্গাকার অথবা ভূপৃষ্ঠে দখলকৃত আয়তন অনুযায়ী অন্য কোনো জ্যামিতিক আকৃতির হতো। রাত ও দিনের আয়তনের ভিন্নতার কারণে অবস্থাটি এমন হতে পারতো। কিন্তু আল্লাহ তাআলার বাণী: "তিনি রাতকে দিনের উপর পেঁচিয়ে দেন এবং দিনকে রাতের উপর পেঁচিয়ে দেন" এই কথার প্রমাণ যে, পৃথিবীর এক অর্ধাংশ রাত থাকে এবং অন্য অর্ধাংশ দিন থাকে।

২- যখন বিজ্ঞানের উন্নতি হলো এবং মানুষ মহাকাশে আরোহণ করলো এবং পৃথিবীকে দেখলো ও তার ছবি তুললো, তখন আমরা দেখতে পেলাম,

প্রকৃতপক্ষে এর অর্ধেক অংশ আলোকিত এবং অর্ধেক অংশ অন্ধকার, যেমনটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের সংবাদ দিয়েছেন। (১)

(১) শাইখ মুহাম্মাদ মেতওয়াল্লী আশ-শারাভী রচিত "আল-আদিল্লাহ আল-মাদদিয়্যাহ আলা উজুদিল্লাহ" ('আল্লাহর অস্তিত্বের বস্তুগত প্রমাণাদি')

অষ্টম দিক: পবিত্র কুরআন প্রমাণ করে যে, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন পৃথিবীর গোলত্বের একটি প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা বলেন: "নিশ্চয় তোমাদের রব আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ ও জমিনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আরশের উপর উঠেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন, যা দ্রুতগতিতে তার পিছু নেয়। আর সূর্য, চন্দ্র ও নক্ষত্ররাজি তাঁরই আজ্ঞাবহ। জেনে রেখো, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই। বরকতময় আল্লাহ, যিনি জগতসমূহের রব।" (আল-আরাফ: ৫৪)।

ড. যাগলুল আন-নাজ্জার বলেছেন: কুরআনুল কারীম পৃথিবীর গোলত্ব সম্পর্কে এমন এক যুগে আলোচনা করেছে যখন মূর্খতা ও কুসংস্কারের জয়জয়কার ছিল। এই আয়াতসমূহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা উল্লেখ করেছেন যে, দিন রাতকে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে খুঁজে বেড়ায়। 'হাতীছান' (حثيثاً) শব্দের অর্থ হলো: কোনো বিরতিহীনভাবে দ্রুতগতিতে পিছু নেওয়া। আসুন আমরা বিষয়টি এভাবে কল্পনা করি... দিন হলো সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত আলো যা মহাকাশ ও বায়ুমণ্ডলের চারদিক পূর্ণ করে ফেলে। আর রাত হলো অন্য এক অবস্থা যাতে উল্কাপিণ্ডের ক্ষীণ আলো ছাড়া আর কোনো আলো নেই। দিন রাতকে দ্রুতগতিতে তাড়া করে এবং রাত দিনকে তাড়া করে। এটি বিরতিহীনভাবে এভাবেই চলতে থাকে। কিন্তু কোথায়? এবং কীভাবে? তারা

কি এমন কোনো সোজা পথে চলে যার প্রান্ত সীমাহীন?

যদি বিষয়টি এমনই হতো তবে জমিনের ওপর দিয়ে একবার মাত্র দিন অতিবাহিত হয়ে রাত আসত এবং সেখানেই বিষয়ের সমাপ্তি ঘটত। কিন্তু আমরা তাদের পর্যায়ক্রমে আসতে দেখি। প্রতিদিন দিন ঠিক সেই দিক থেকেই উদিত হয় যেদিক থেকে আগের দিন হয়েছিল এবং সূর্য ঠিক সেই দিকেই অস্ত যায় যেদিকে গতদিন গিয়েছিল। এভাবেই পূর্ব দিক থেকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসে এবং পশ্চিমে গিয়ে ডুবে যায়। এরপর এই দৃশ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটে এবং আল্লাহর ইচ্ছা অনুযায়ী তা চলতেই থাকে।

আল্লাহ তাআলার বাণী: **"যা দ্রুতগতিতে তার পিছু নেয়"** এর মধ্যকার গতির ধরনটি যদি আমরা কল্পনা করি, তবে আমরা এই বাস্তবতার মাধ্যমে দেখতে পাই যে এর পথটি বৃত্তাকার যাতে কোনো সন্দেহ নেই। এটি সহজে উপলব্ধি করার জন্য কুরআনের এই চিত্রায়ন পদ্ধতিটি আমাদের ভালোমতো বুঝতে হবে। তখন এই আয়াতের মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, আমরা পৃথিবীর চারদিকে একটি বৃত্তাকার পথের চিত্র খুঁজে পাচ্ছি যার ওপর দিবা-রাত্রি আবর্তিত হয়; এটি একে আচ্ছাদিত করে এবং ওটি ওকে আচ্ছাদিত করে। (১)

(১) তাঁর নিজস্ব ওয়েবসাইট দ্রষ্টব্য।

নবম দিক: আল্লাহ তাআলার বাণী: "এবং তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনকে প্রসারিত করেছেন" এর সাথে সংশ্লিষ্ট একটি সংশয়ের নিরসন।

"এবং আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি" — এটি পৃথিবী গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী নয়। আল্লাহ বলেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনকে বিস্তৃত

করেছেন এবং তাতে অটল পর্বত স্থাপন করেছেন।" (সূরা আর-রাদ: ৩), "এবং আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি এবং তাতে অটল পর্বত স্থাপন করেছি।" (সূরা আল-হিজর: ১৯)।

প্রথমত: (আল-মাদ্দ/বিস্তৃতি): এটি হলো এমনভাবে প্রসারিত করা যার শেষ সীমানা উপলব্ধি করা যায় না।

আবু আবদুল্লাহ আদ-দারানি বলেন: প্রমাণের মাধ্যমে এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে পৃথিবী একটি গোলক, আর এটি তাঁর বাণী "জমিনকে বিস্তৃত করেছেন" এর সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ পৃথিবী একটি বিশাল বস্তু, আর গোলক যখন অত্যন্ত বিশাল হয়, তখন এর প্রতিটি খণ্ডকে সমতল হিসেবে দেখা যায়। (১)

ইবনে আদিল বলেন: আল্লাহ যখন আসমানি প্রমাণাদি সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, তখন তার পরপরই জমিনের প্রমাণাদি উল্লেখ করে বলেছেন: "তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন" অর্থাৎ একে প্রশস্ত করেছেন। আল-আসাম্ম বলেন: (আল-মাদ্দ) হলো এমনভাবে প্রশস্ত করা যার শেষ প্রান্ত দৃষ্টিগোচর হয়না। সুতরাং আল্লাহর বাণী, "জমিনকে বিস্তৃত করেছেন" একথাটি অনুধাবন করানোর জন্য যে, আল্লাহ তাআলা জমিনের আয়তনকে এত বিশাল করেছেন যে মানুষের দৃষ্টি এর শেষ প্রান্তে পৌঁছাতে পারে না।

ইবনুল খতিব বলেন: যদি তারা বলে: আল্লাহ তাআলার বাণী "জমিনকে বিস্তৃত করেছেন" তা গোলাকার হওয়ার পরিপন্থী! আমরা বলব: আমরা তা স্বীকার করি না; কারণ পৃথিবী একটি বিশাল বস্তু, আর গোলক যখন অত্যন্ত বিশাল হয়, তখন আপনার কাছে এর প্রতিটি অংশ সমতল হিসেবেই পরিদৃষ্ট হবে। সমতল ও গোলকের মধ্যকার এই যে পার্থক্য, তা কেবল আল্লাহ

তাবারাকা ওয়া তাআলার জ্ঞান ছাড়া অন্য কোথাও ধরা পড়ার মতো নয়; তবে আল্লাহ তাআলার বাণী "এবং পাহাড়সমূহকে পেরেকরূপে স্থাপন করেছি" (সূরা আন-নাবা: ৭) এর ক্ষেত্রে যেমন মানুষ তার ওপর স্থিতিশীল থাকে, এখানেও বিষয়টি তেমনি। (২)

(১) তাফসীরে আল-বাহরুল মুহিত (৭/৮০)।

(২) তাফসীরে আল-লুবাব (৯/৩৭৯; সূরা আর-রাদ: ৩)।

দ্বিতীয়ত: আশ-শা'রাভী বলেন:

১. আমি বিশ্বাস করি যে নবী (সা.)-এর যুগে কোনো মানুষই পৃথিবীর গোলাকার হওয়া সম্পর্কে কিছু জানত না, অথবা তা কারো জ্ঞান পর্যন্ত পৌঁছেনি। এমতাবস্থায় কুরআন এসে বলছে: **"এবং আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি।"** এখানে কুরআনের শব্দচয়নের সূক্ষ্মতা লক্ষ্য করুন; এটি এমন এক শব্দ নির্বাচন করেছে যা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময়কাল এবং পরবর্তী সকল যুগের জন্য উপযুক্ত। কারণ 'মাদাদনাহা' (আমরা একে বিস্তৃত করেছি) শব্দটি একই সাথে উভয় অর্থ প্রদান করে।

২. যখন তিনি বলেন: **"আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি,"** অর্থাৎ: আমরা তা প্রসারিত করেছি; এতে কোনো সমস্যা সৃষ্টি হয় না। কারণ তৎকালীন মানুষের সামনে পৃথিবী বিস্তৃত বা সমতল রূপেই প্রকাশিত ছিল। তবে কালক্রমে যখন পৃথিবী গোলাকার হওয়ার বিষয়টি প্রমাণিত হলো, তখন আমরা দেখতে পাই যে, এই শব্দটিই পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার নিখুঁত বর্ণনার জন্য সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

তিনি বলেন: কুরআন হলো আল্লাহর কালাম, কিয়ামত পর্যন্ত এর তিলাওয়াত ইবাদত হিসেবে গণ্য। এর অর্থ হলো, কুরআনের সাথে মহাবিশ্বের বৈজ্ঞানিক

সত্যগুলোর কোনো সংঘর্ষ হওয়া সমীচীন নয়। কারণ কুরআন মাজিদ পরিবর্তন বা পরিমার্জনযোগ্য নয়। যদি এ জাতীয় কোনো সংঘর্ষ ঘটত, তবে দ্বীনের মূল ভিত্তিই নড়বড়ে হয়ে যেত। প্রকৃতপক্ষে সংঘর্ষ দুটি কারণে ঘটে: কুরআনের কোনো সত্য যথাযথভাবে না বোঝা অথবা বৈজ্ঞানিক তথ্যের অসত্যতা। যদি আমরা কুরআনকে সঠিকভাবে না বুঝি এবং এর প্রকৃত মর্মের বাইরে ব্যাখ্যা করি, তবেই সংঘর্ষের উদ্রেক হয়। আবার যদি বৈজ্ঞানিক তথ্যটিই ভ্রান্ত হয়, তবেও সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু আমরা কুরআনের সত্য বুঝতে ব্যর্থ হই কীভাবে? এর জন্য আমরা একটি উদাহরণ পেশ করব, যাতে মানুষ জানতে পারে যে কুরআনিক সত্য যথাযথভাবে না বোঝার কারণে মহাজাগতিক বাস্তবতার সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হতে পারে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তাঁর সম্মানিত কিতাবে বলেন: **"আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি।"** (সূরা হিজর: ১৯)। 'মাদ' (প্রসারণ) শব্দের অর্থ হলো: বিস্তার। এর মর্ম হলো পৃথিবী বিস্তৃত। যদি আমরা আয়াতটিকে কেবল এই অর্থেই বুঝি, তবে যারা পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার কথা বলে তাদের সবাইকে কাফির সাব্যস্ত করার মতো পরিস্থিতির উদ্ভব হতে পারে—বিশেষ করে বর্তমানে যখন আমরা মহাকাশযান ও কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে পৃথিবীকে তার নিজ অক্ষের ওপর ঘূর্ণায়মান একটি গোলক হিসেবে দেখতে পাচ্ছি।

আমরা বলব: যারা এই সম্মানিত আয়াত **"আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি"**-এর অর্থ কেবল সমতল হিসেবে বুঝেছেন, তারা এই আয়াতে বর্ণিত কুরআনিক সত্যটি অনুধাবন করতে পারেননি। মূলত এর অর্থ ভাষাগত অলৌকিকত্ব এবং বৈজ্ঞানিক অলৌকিকত্ব—উভয়কেই ধারণ করে। এটি

একই সাথে চাক্ষুষ দৃশ্যমান বাস্তবতা এবং কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার সময় মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচরে থাকা বৈজ্ঞানিক সত্যকেও উপস্থাপন করে।

সত্য স্বরূপ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যখন বললেন: **"আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি"** অর্থাৎ: আমরা তা প্রসারিত করেছি; তখন তিনি কি নির্দিষ্ট কোনো ভূমির কথা বলেছেন? না, তিনি নির্দিষ্ট কোনো ভূখণ্ড নির্ধারণ করেননি, বরং সামগ্রিকভাবে 'ভূমি' বা 'পৃথিবী'র কথা বলেছেন। এর অর্থ হলো, তুমি যে স্থানেই পৌঁছাও যাকে 'ভূমি' বলা হয়, দেখবে তা তোমার সামনে বিস্তৃত অর্থাৎ সমতল। তুমি যদি দক্ষিণ মেরুতে থাকো, কিংবা উত্তর মেরুতে, অথবা আমেরিকায়, ইউরোপে, আফ্রিকায়, এশিয়ায় বা পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তে থাকো—তুমি তোমার সামনে তাকে বিস্তৃতই দেখতে পাবে। আর এমনটি ঘটা তখনই সম্ভব যদি পৃথিবী গোলাকার হয়। যদি পৃথিবী বর্গাকার, ত্রিভুজাকার, ষড়ভুজাকার কিংবা অন্য কোনো জ্যামিতিক আকৃতির হতো, তবে আপনি এমন এক প্রান্তে পৌঁছাতেন যেখানে আপনার সামনে আর বিস্তৃত ভূমি দেখা যেত না; বরং আপনি ভূমির শেষ প্রান্ত এবং তারপর মহাশূন্য দেখতে পেতেন। কিন্তু একমাত্র যে জ্যামিতিক আকৃতিতে পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে ভূমিকে বিস্তৃত দেখা সম্ভব, তা হলো পৃথিবী গোলাকার হওয়া। এমনকি আপনি যদি ভূপৃষ্ঠের কোনো নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে যাত্রা শুরু করে পুনরায় সেই প্রারম্ভিক বিন্দুতে ফিরে আসা পর্যন্ত চলতে থাকেন, তবে আপনার পুরো পথচলায় ভূমিকে সর্বদা আপনার সামনে বিস্তৃতই দেখতে পাবেন। আর যতক্ষণ বিষয়টি এমন, আপনি পৃথিবীর যে প্রান্তেই চলেন না কেন, তাকে আপনার সামনে বিস্তৃতই দেখতে পাবেন। এভাবেই পবিত্র আয়াতের বাণীটি এসেছে: "আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি"। কিছু লোক

একে পৃথিবী সমতল হওয়ার দলিল হিসেবে বুঝেছে, অথচ এটিই পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রমাণ। আর এটিই পবিত্র কুরআনের অলৌকিকত্ব। কুরআন এমন শব্দ চয়ন করে যা বস্তুর বাহ্যিক রূপের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয় এবং একইসাথে তার মহাজাগতিক বাস্তবতারও পরিচয় দেয়।

এ কারণেই যারা এই পবিত্র আয়াতটি ভুল বুঝেছে এবং এর অর্থ পৃথিবী সমতল বলে গ্রহণ করেছে, তারা বলেছে: ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে সংঘাত রয়েছে। আর যারা এই আয়াতের সঠিক অর্থ অনুধাবন করেছে, তারা বলেছে: পবিত্র কুরআনই বিশ্বের প্রথম কিতাব যা উল্লেখ করেছে যে পৃথিবী গোলাকার। কেবল এই সত্যটিই তাদের ঈমান আনার জন্য যথেষ্ট ছিল; কিন্তু তারা বিশ্বাস করে না। এভাবেই আমরা কুরআনিক অলৌকিকত্ব দেখতে পাই। কারণ এর বক্তা আল্লাহ, স্রষ্টা আল্লাহ এবং কথকও আল্লাহ। সুতরাং কুরআনের আয়াতের একটি অংশে আমাদের জানানো হয়েছে যে পৃথিবী গোলাকার এবং এটি নিজের অক্ষের ওপর আবর্তন করে। এই দুটি সত্য একত্রিত হওয়া ছাড়া এই পবিত্র আয়াতের অর্থের সঠিক সমন্বয় সম্ভব নয়। আল্লাহই যে এই মহাবিশ্বের স্রষ্টা, এর চেয়ে বড় বস্তুগত প্রমাণ আর কী হতে পারে? (১)

(১) তার "আল-আদিল্লাহ আল-মাদদিয়্যাহ আলা উজুদিল্লাহ" গ্রন্থ থেকে।

শায়খ শা'রাভী আরও বলেছেন:

১. কোনো ব্যক্তি এসে বলে: পৃথিবী সমতল। সে এর স্বপক্ষে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন: "আর আমি জমিনকে বিস্তৃত করেছি" অর্থাৎ আমি একে বিছিয়ে দিয়েছি; কারণ 'মদ্দ' বা

বিস্তারের অর্থ হলো বিছিয়ে দেওয়া। সে এটাকে কুরআনিক ধ্রুব সত্য হিসেবে ধরে নিয়েছে। এমনকি মানুষ বায়ুমণ্ডলের বাইরে গিয়ে পৃথিবীকে গোলাকার দেখার পরও এই ব্যক্তি বিজ্ঞানের সত্যতাকে প্রত্যাখ্যান করে বলে: না, পৃথিবী সমতল! এভাবেই তিনি বলেছেন: কুরআন ছাড়া অন্য সবকিছুই কি কুফুর?!

আমরা তাকে বলি: আপনি কুরআনিক সত্য উপলব্ধিতে ভুল করেছেন। আপনি যে দলিলটি পেশ করেছেন তা আপনার দাবির সপক্ষে কোনো কাজ দেয় না; বরং তা আপনার দাবির বিপরীত। কারণ পৃথিবী যদি সমতল হতো তবে তা কয়েকটি আকারের বাইরে হতো না: হয় বর্গাকার, নয়তো ত্রিভুজাকার, নয়তো আয়তাকার, নয়তো সামান্তরিক, অথবা ট্রাপিজিয়াম কিংবা অন্য কোনো অসমবাহু আকৃতির। সংক্ষেপে, গোলাকার বা গোলক আকৃতি ছাড়া পৃথিবীর অন্য যেকোনো অবস্থা কল্পনা করার দায়িত্ব আমি আপনার ওপরই ছেড়ে দিচ্ছি।

২. "আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি" অর্থাৎ: পৃথিবী গোলাকার। পৃথিবী যতক্ষণ সমতল থাকবে, ততক্ষণ তার একটি নির্দিষ্ট সীমানা থাকা আবশ্যক। সুতরাং আপনি যখন সমতলের শেষ প্রান্তে পৌঁছাবেন, তখন অবশ্যই একটি কিনারায় গিয়ে উপনীত হবেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলছেন: "আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি"। 'বিস্তৃত করেছি' কথাটির অর্থ হলো: আপনি ভূ-পৃষ্ঠের যেখানেই যান না কেন, আপনি তা আপনার সামনে বিস্তৃতই দেখতে পাবেন; অর্থাৎ আপনার সামনে তা সমতল মনে হবে। আপনি যদি উত্তর মেরুতে যান তবে পৃথিবীকে সমতল দেখবেন, আর যদি দ্রুত দক্ষিণ মেরুতে যান তবে সেখানেও পৃথিবীকে সমতল দেখবেন। আবার যদি আপনি

বিষুবরেখায় যান তবে সেখানেও পৃথিবীকে আপনার সামনে সমতলই পাবেন। আমরা যেখানেই যাই না কেন পৃথিবীকে সমতল দেখতে পাই; আর এটি কেবল তখনই সম্ভব যদি পৃথিবী গোলাকার হয়। অতএব, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার বাণী: "আর আমি ভূমিকে বিস্তৃত করেছি" পৃথিবীর গোলাকার হওয়ারই প্রমাণ।

৩. কিন্তু কোনো মানুষ ভুলবশত এই শব্দটিকে পৃথিবী সমতল হওয়ার দলিল হিসেবে ব্যাখ্যা করেছে। ফলে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে এটি একটি কুরআনিক সত্য; অথচ এটি কুরআনিক সত্য নয়। যখনই প্রমাণিত হলো যে পৃথিবী গোলাকার, তখনই জাগতিক সত্য ও কুরআনিক সত্যের মধ্যে একটি কাল্পনিক বিরোধ শুরু হয়ে গেল। আর এখানেই আল্লাহর কিতাবকে হেয় করার প্রচেষ্টায় মূর্খতার ভূমিকা প্রকাশ পায়। কিছু লোক যদি সামান্য গভীরভাবে চিন্তা করত তবে তারা জানতে পারত যে, পৃথিবীর গোলাকার হওয়া এবং এর ঘূর্ণন—উভয় বিষয়ই কুরআনে বিদ্যমান রয়েছে।(১)

(১) মুজিজাতুল কুরআন (১/ ৪৮-৪৯)।

তৃতীয়ত: একইভাবে আয়াতটি এই অর্থ প্রদান করে যে, আল্লাহ পৃথিবীকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে নির্ধারণ করেছেন যা বাড়েও না, কমেও না।

ইবনুল খতিব বলেছেন: এই আয়াতটি কেবল স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রমাণ পেশ করার জন্য উল্লেখ করা হয়েছে। আর এর শর্ত হলো, বিষয়টি এমন হতে হবে যা প্রত্যক্ষ করা যায় এবং যা সুপরিচিত, যাতে স্রষ্টার অস্তিত্বের সপক্ষে তার মাধ্যমে দলিল পেশ করা সঠিক হয়। কারণ আপনি যদি এর আয়তন ও পরিমাণ দেখেন, তবে সেই আয়তন ও পরিমাণ একটি শিক্ষণীয় বিষয়ে

পরিণত হয়। সুতরাং এটি প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর বাণী: "তিনি ভূমিকে প্রসারিত করেছেন" একটি ইঙ্গিত যে, আল্লাহ তাআলাই ভূমিকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন যা বৃদ্ধি পায় না এবং হ্রাসও পায় না। এর প্রমাণ হলো, ভূমির আয়তন বর্তমানের চেয়ে বেশি বা কম হওয়া সত্তাগতভাবে একটি সম্ভবপর বিষয়। অতএব, একে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে বিশিষ্ট করা অবশ্যই কোনো বৈশিষ্ট্য প্রদানকারীর নির্দিষ্টকরণ এবং কোনো পরিমাপকারীর পরিমাপ অনুযায়ী হতে হবে। (১)

(১) তাফসীরুল লুবাব, ৯/৩৭৯; সূরা আর-রাদ: ৩)

চতুর্থত: ভূমির প্রসারণ ও বিস্তৃতি এর গোলাকার হওয়ার দাবি রাখে; কারণ অন্য যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতি (যেমন: ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, পঞ্চভুজ...) এক বাহু থেকে অন্য বাহুতে স্থানান্তরের সময় সেখানে অবশ্যই একটি বাঁক বা কোণ থাকতে হবে।

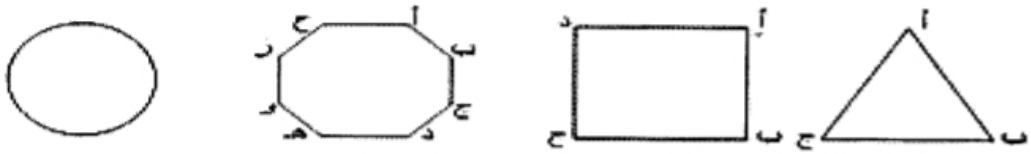
আয়াতের প্রেক্ষাপট নির্দেশ করে যে, আল্লাহ মানুষকে সম্বোধন করছেন, বরং পুরো কুরআনই মানুষের প্রতি সম্বোধন। যখন তিনি বলেন: "আর ভূমিকে আমি বিস্তৃত করেছি," তখন আমরা প্রশ্ন করি, এটি কার জন্য? উত্তর হলো: হে মানুষ! আমি তোমার জন্য একে বিস্তৃত করেছি। ভূমি কীভাবে বিস্তৃত থাকে? আর এর অর্থই বা কী?

এর অর্থ হলো, আমরা এতে চলাচলের পথ সুগম করে দিয়েছি, ফলে এটি আমাদের সামনে সর্বদা বিস্তৃতই থাকবে। সেখানে এমন কোনো প্রতিবন্ধকতায় গিয়ে তা শেষ হবে না যা তার পরবর্তী অংশ থেকে আড়াল করবে, অথবা এমন কোনো চিরস্থায়ী অতল গহ্বর আসবে না যার সামনে

আমরা অসহায় হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ব।

সুতরাং আমরা আমাদের ইচ্ছামতো যেকোনো দিকে চলতে থাকি, আর রাত, মাস, বছর এবং পুরো আয়ু অতিবাহিত হয়ে যাক না কেন, আমরা চলতেই থাকব আর ভূমিও বিস্তৃতই থাকবে। জ্যামিতিক আকৃতিগুলোর মধ্যে গোলাকার আকৃতি ব্যতীত আর কোনো আকৃতিতে এই অবস্থা পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ আপনি এর ওপর যেদিকেই চলবেন, তা আপনার সামনে বিস্তৃতই থাকবে। অন্য কোনো আকৃতি এই আয়াতের অর্থের প্রতিফলন ঘটাতে সক্ষম নয়। ভূমির প্রসারণ ও বিস্তৃতি এর গোলাকার হওয়ার দাবি রাখে; কারণ অন্য যেকোনো জ্যামিতিক আকৃতি (যেমন: ত্রিভুজ, বর্গক্ষেত্র, পঞ্চভুজ...) এক বাহু থেকে অন্য বাহুতে স্থানান্তরের সময় সেখানে অবশ্যই বাঁক বা বিচ্যুতি থাকতে হবে।

নিচের চিত্রটির দিকে লক্ষ্য করুন যা কয়েকটি জ্যামিতিক আকৃতি উপস্থাপন করছে। বৃত্ত ব্যতীত প্রতিটি বাহুকে নির্দিষ্ট বর্ণ, যেমন: **(ا، ب، ج...)** দিয়ে প্রকাশ করা হয়েছে, কারণ বৃত্তের কোনো বাহু নেই।



ঠিক যেমন কুরআনের এই অলৌকিক অভিব্যক্তিতে ভূমির বিস্তৃতি ও প্রসারের বর্ণনায় দুটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তবতার মিলন ঘটেছে পর্যবেক্ষণ এবং বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে; এটি দৃশ্যমান চোখের বিচারে বিস্তৃত ও সমতল, যা এর ওপর জীবনধারণ সহজ করে তোলে। যদি এটি বৃত্তাকার ছাড়া অন্য কোনো জ্যামিতিক আকৃতির হতো, তবে আপনি যখন এর কোনো একটি বাহুর

ওপর দাঁড়াতেন, তখন আপনি এর বক্রতা দেখতে পেতেন।

আর বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দিক থেকেও এটি বৃত্তাকার; কারণ বৃত্তাকার আকৃতি এর বিস্তৃতি নির্দেশ করে। বৃত্তই একমাত্র জ্যামিতিক আকৃতি যাতে পৃথিবী এর প্রতিটি বিন্দুতে—যেখানেই আপনি দাঁড়ান না কেন—প্রসারিত থাকতে পারে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই এমনটি প্রমাণিত হয়নি যে, কেউ পথ চলার সময় তার পথকে বেঁকে যেতে দেখেছে; যেভাবে (ا) থেকে (ب) বাহু পর্যন্ত চলাচলকারীর পথ বেঁকে যায়। আর এই বিষয়টি তার কাছে স্পষ্ট যে পৃথিবীর কেন্দ্র থেকে এর যেকোনো প্রান্তের দিকে ভ্রমণ করে; আর এটি কেবল গোলকীয় আকৃতিতেই সম্ভব।

পঞ্চমত: কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে ব্যাপকভাবে প্রসারিত করা হবে।

আল্লাহর বাণী: **"আর যখন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে"** সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এটি কিয়ামতের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট। কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে প্রসারিত করা হবে; অর্থাৎ চামড়া প্রসারিত করার ন্যায় তাকে একবার সুনিপুণভাবে প্রসারিত করা হবে। যেন তা একটি চামড়া বা দস্তরখান বিছিয়ে দেওয়ার মতো। আছারে এসেছে: "যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার ন্যায় প্রসারিত করা হবে।" আর 'আদীম' অর্থ হলো পাকা করা চামড়া। সুতরাং সম্প্রসারণ কখনও নিরঙ্কুশ হতে পারে যেমনটি কিয়ামতের দিন পৃথিবীর ক্ষেত্রে ঘটবে, আবার কখনও আপেক্ষিক হতে পারে যেমনটি সৃষ্টির শুরুতে পৃথিবীর ক্ষেত্রে হয়েছিল। (১)

(১) আবদুল্লাহ ইবনে আমর থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করা হবে।"

ইবনে জারীর তার তাফসিরে (১২/৪১৮) এটি বর্ণনা করেছেন। আলবানি বলেছেন: এর সনদ উত্তম (আস-সিলসিলাতুস সহীহাহ, ১৯৬৬)। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "(সেদিন) পাহাড়গুলোকে চূর্ণবিচূর্ণ করে উড়িয়ে দেওয়া হবে এবং পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করা হবে।" ইমাম আহমাদ এটি বর্ণনা করেছেন (১/৩৭৫, হাদিস নম্বর ৩৫৫৬), ইবনে আবি শায়বাহ (৭/৪৯৮, হাদিস নম্বর ৩৭৫২৫), ইবনে মাজাহ (৪০৮১) এবং হাকেম (৪/৫৮৮)। হাকেম বলেছেন: (এর সনদ সহীহ), যাহাবী তার সাথে একমত হয়েছেন। আর আলবানি একে যঈফ (দুর্বল) বলেছেন (আয-যঈফাহ, ৪৩১৮)। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: "যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করা হবে।" ইবনে জারীর তার তাফসিরে (১২/৫৭৬) এটি বর্ণনা করেছেন। আলী ইবনুল হুসাইন থেকে মুরসাল সূত্রে বর্ণিত: "যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করবেন, ফলে মানুষের জন্য সেখানে তাদের দুই পা রাখার জায়গা ব্যতীত আর কোনো স্থান থাকবে না।" আবদুর রাজ্জাক তার তাফসিরে (৪/৮৭-১৫৬৬) এবং ইবনে জারীর তার তাফসিরে (৮/১২৯) এটি বর্ণনা করেছেন। আবু হুরায়রা থেকে মারফু সূত্রে বর্ণিত: "আল্লাহ জমিনকে অন্য জমিনে পরিবর্তন করবেন এবং আকাশসমূহকেও; অতঃপর তিনি পৃথিবীকে বিছিয়ে দেবেন এবং সমতল করবেন এবং চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করবেন।" ইবনে জারীর তার তাফসিরে (৭/৪৭৯) এটি বর্ণনা করেছেন এবং এর সনদে একজন অজ্ঞাত রাবী রয়েছে। সুতরাং কিয়ামতের দিন পৃথিবীকে চামড়া প্রসারিত করার মতো প্রসারিত করা হবে—এই বিষয়টি মাওকুফ সনদে সহীহ হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে।

দশম দিক: মহান আল্লাহর বাণী "আর পৃথিবীর দিকে, তা কীভাবে সমতল করা হয়েছে" এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংশয়ের উত্তর এবং মানুষের জন্য আপেক্ষিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়টি স্পষ্টিকরণ।

ইবনুল কাইয়্যিম রাহিমাহুল্লাহ বলেন:

১. পৃথিবীর নিদর্শনাবলী অনেক প্রকারের: এর মধ্যে রয়েছে একে সমতল করা, যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন: "আর পৃথিবীর দিকে, তা কীভাবে সমতল করা হয়েছে"। এটি তার গোলাকার হওয়ার সাথে সাংঘর্ষিক নয়, কারণ বাস্তবে এটি একটি গোলক যার উপরিভাগ সমতল, যেখানে প্রাণীরা বসবাস করে। এর মধ্যে আরও রয়েছে যে, তিনি একে বিছানা বানিয়েছেন যাতে এটি প্রাণীদের আবাস ও বসবাসের স্থান হয় এবং একে স্থিতিশীল করেছেন। তিনি একে অনুগত শয্যা বানিয়েছেন যা পদতলে দলিত হয় এবং কুড়াল ও কোদালের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয় এবং নিজ পিঠে ভারী দালানকোঠা বহন করে। সুতরাং এটি বান্দার ইচ্ছার জন্য অনুগত ও নিয়োজিত। তিনি একে গালিচা বানিয়েছেন এবং একে জীবিতদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন যা তাদের নিজ পিঠে ধারণ করে এবং মৃতদের জন্য যা তাদের পেটের ভেতর ধারণ করে। তিনি একে বিস্তৃত করেছেন, প্রসারিত করেছেন এবং উন্মুক্ত করেছেন। ফলে একে উদ্দিষ্ট কাজের জন্য প্রস্তুত করেছেন এর থেকে পানি ও চারণভূমি বের করার মাধ্যমে, এতে নদীসমূহ প্রবাহিত করেছেন এবং এতে পথ ও গিরিপথ তৈরি করেছেন।

২. তিনি একে শয্যা ও বিছানা বানানোর মাধ্যমে একে স্থির রাখার প্রজ্ঞার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, যা অন্য একটি নিদর্শন। কারণ এর নিচে এটিকে ধরে

রাখার জন্য কোনো স্তম্ভ নেই এবং এর উপরে কোনো ঝুলন্ত রশি নেই। তিনি একে স্থিতিশীল করার মাধ্যমে এই প্রজ্ঞার দিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, এটি অত্যন্ত নরম, শিথিল বা কাদার মতো করে সৃষ্টি করা হয়নি, অন্যথায় তা দালানকোঠাকে ধরে রাখতে পারত না এবং এর ওপর প্রাণী বা ভারী বস্তু স্থির থাকতে পারত না। বরং তিনি একে কঠোরতা ও কোমলতার মধ্যবর্তী করেছেন। (১)

(১) আত-তিবইয়ান ফি আকসামিল কুরআন (১/১৮৩)।

একাদশ দিক: মহান আল্লাহর বাণী "আর এরপর তিনি পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন, তিনি তা থেকে পানি ও চারণভূমি বের করেছেন" (সূরা আন-নাযিআত: ৩০, ৩১) এর সাথে সংশ্লিষ্ট সংশয়ের উত্তর।

প্রথমত: পৃথিবী বিস্তৃতকরণ এবং ডিমের বিস্তৃতির মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ দিক:

আর-রাযী বলেন: ভাষাবিদগণ বলেন: এই শব্দটির ক্ষেত্রে ভাষার দুটি রূপ রয়েছে: 'দাহাওতু আদহু' এবং 'দাহাইতু আদহি'। এর উদাহরণ হলো: 'সাফাওতু' ও 'সাফাইতু', কাঠের বাকল ও দাড়ি কামানোর ক্ষেত্রে 'লাহাওতু' ও 'লাহাইতু', মানুষের সাথে মন্দ আচরণ করার ক্ষেত্রে 'সাআওতু' ও 'সাআইতু', এবং দাম্ভিকতা করার ক্ষেত্রে 'বাআওতু' ও 'বাআইতু'।

আর আলি (তাঁর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক)-এর একটি বর্ণনায় এসেছে: "হে আল্লাহ! হে বিস্তৃত বিষয়সমূহের বিস্তারকারী।" অর্থাৎ: সাত জমিনের বিস্তারকারী। এটি 'মাদহুওয়াত' রূপেও বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে: 'দাহ্উ' শব্দের মূল অর্থ হলো কোনো বস্তুকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে সরিয়ে নেওয়া। এ থেকেই বলা হয়: শিশুটি বল নিয়ে খেলছে (ইয়াদহু), অর্থাৎ

সেটিকে জমিনের ওপর নিক্ষেপ করছে। আর উটপাখির 'আদহা' হলো তার থাকার জায়গা, অর্থাৎ সে জায়গাটিকে সমতল করে এবং সেখান থেকে পাথর সরিয়ে দেয় যাতে তা তার জন্য আরামদায়ক হয়। এটি প্রমাণ করে যে, 'দাহ্উ'-এর অর্থ অপসারণ করা ও প্রস্তুত করার দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (১)

তিনি আরও বলেছেন: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা প্রথমে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তারপর দ্বিতীয়ত আসমান সৃষ্টি করেছেন, এরপর তৃতীয়ত পৃথিবীকে বিস্তৃত করেছেন; অর্থাৎ একে প্রসারিত করেছেন। এর কারণ হলো পৃথিবী শুরুতে একটি পুঞ্জীভূত গোলকের মতো ছিল। আর তাঁর বাণী: "তিনি একে বিস্তৃত করেছেন"-এর অর্থ কেবল সাধারণ বিস্তার নয়, বরং উদ্দেশ্য হলো একে খাদ্যশস্য উৎপাদনের উপযোগী করে বিস্তৃত করা। আর এটিই তিনি তাঁর এই বাণীর মাধ্যমে স্পষ্ট করেছেন: "তিনি তা থেকে তার পানি ও চারণভূমি নির্গত করেছেন।" (২)

এই আয়াতে অলঙ্কারশাস্ত্রের একটি সুপরিচিত দিক রয়েছে; যা হলো আধারের (স্থান) নাম উল্লেখ করে আধেয়কে (যা সেখানে আছে) বোঝানো।

ড. আব্দুল মুনিম বলেন: আমাদের চলিত ভাষায় আমরা বলি: 'দিহইয়ু' মানে ডিম, আর এর একবচন হলো 'দিহইয়াহ'। আর 'উদহুওয়াহ' হলো বালুর মধ্যে উটপাখির ডিম পাড়ার স্থান; এটি একটি রূপক যার সম্পর্ক হলো স্থানিক। (৩)

দ্বিতীয়ত: উটপাখি তার বাসার স্থান প্রস্তুত করে:

১. ভূপৃষ্ঠে জীবনকে সহজসাধ্য করার জন্য আল্লাহর এক বিশেষ ব্যবস্থা হলো একে গোলাকার করা। যদি এটি গোলাকার না হতো, তবে এতে জীবনযাপন

অসম্ভব হয়ে পড়ত; যেমন উটপাখি তার বাসার জায়গাটি প্রস্তুত ও মসৃণ করে যাতে ডিম পাড়ার জন্য তা সুগম হয়। যদি এমনটি না হতো তবে ডিমগুলো ভেঙে যেত। উটপাখি ভূমিকে এমনভাবে বিস্তৃত করবে যে তা আয়নার মতো সমতল হয়ে যাবে যাতে সে তার ডিম পাড়তে পারে—এমনটি কল্পনা করা যায় না; অন্যথায় তা দূরে গড়িয়ে যেত, আর সে (উটপাখি) তার ডিমগুলোকে নিজের কোলে একত্র করতে সক্ষম হতো না এবং চাক্ষুষ দৃষ্টি ও স্থান-কালের প্রতিকূলতা থেকে সেগুলোকে নিরাপদ রাখতে পারত না।

(১) তাফসিরে রাযী ১৬/৩৪২; আলি (রা.)-এর উক্তি: "হে আল্লাহ! হে বিস্তৃত বিষয়সমূহের বিস্তারকারী" এর সনদ দুর্বল। তাবারানি (আল-আওসাত ৯০৮৯), আজুরি (আশ-শারীয়াহ ৪২৯), এবং ইবনে বাত্তাহ (আল-ইবানাহ ১৫৬১) সকলেই নুহ ইবনে কায়স-এর সূত্রে সালামাহ আল-কিন্দি থেকে এটি বর্ণনা করেছেন, যিনি আলি (রা.) থেকে শোনেননি। দেখুন: আল-জারহু ওয়াত তাদীল ৪/৩০০, জামেউল তাহসিল ২৭৪। সুতরাং সনদটি বিচ্ছিন্ন।
(২) তাফসিরে রাযী (১৬/৩৪২)।
(৩) মু'জামুল আলফাযিল আমিয়্যাহ যাতুল হাকিকাহ ফিল উসুলিল আরাবিয়্যাহ, পৃষ্ঠা: ২৩৩।

২. আর কেনই বা উটপাখি তার ডিম লম্বালম্বিভাবে রাখে? যেন ডিমের বৃহত্তম অংশে কোলের উষ্ণতা সর্বাধিক পরিমাণে ছড়িয়ে পড়তে পারে—এই সকল বিবেচনা এটাই দাবি করে যে, উটপাখির বাসা মাটির একটি গর্ত ছাড়া অন্য কিছু হবে না, অর্থাৎ: নিচের দিকে একটি গোলার্ধের অর্ধাংশ।

৩. এখান থেকেই স্পষ্ট হয় যে, উটপাখি ডিম ধারণের জন্য শক্ত ভূমিকে

‘দাহ্য’ করে (প্রস্তুত করে), যাতে ডিম পাড়ার সময় তা ভেঙে না যায় এবং তা যেন চোখের আড়াল করে সংরক্ষণ করা, ডিমে তা দেওয়া এবং গড়িয়ে না যাওয়ার জন্য উপযুক্ত হয়। আর এটি কেবল শক্ত মাটির ওপর তার পা দিয়ে আঘাত করা এবং ভেতরের দিকে গর্ত করে বাসা তৈরির মাধ্যমেই সম্ভব হয়; যে বাসাটি সাধারণ পর্যবেক্ষকের দৃষ্টিতে সমতল মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তা নিচের দিকে অবতল। আর এখানেই পৃথিবী ও ‘দাহিয়াহ’ (উটপাখির ডিম পাড়ার স্থান)-এর মধ্যে সাদৃশ্যের দিকটি নিহিত।

৪. সাদৃশ্যের অন্য একটি দিক হলো, আল্লাহ এই পৃথিবীটিকেও তাঁর খলিফার (মানুষের) জন্য ‘দাহাহা’ করেছেন (প্রস্তুত করেছেন), এটি মানুষের জন্য এক মমতাময়ী ধাত্রীস্বরূপ, যার এই প্রস্তুতি না থাকলে মানুষ এতে বসবাস করতে সক্ষম হতো না। অতএব, উটপাখির বাসা যদি সমতল হতো তবে তা ডিমে তা দিতে সক্ষম হতো না। আর যদি সে তার পা দিয়ে আঘাত করে শক্ত মাটিকে নরম ধুলোয় পরিণত করার আগেই শক্ত ভূমিতে ডিম পাড়ত, তবে ডিমগুলো ভেঙে যেত; ঠিক তেমনি পুরো পৃথিবী যদি সমতল ও চ্যাপ্টা হতো তবে পৃথিবীর পক্ষে তার উপরিভাগে কোনো আকারেই (সাগর, নদী ও প্রবাহ...) পানি ধরে রাখা সম্ভব হতো না। আর পৃথিবী যদি মাটিহীন নিরেট পাথর হতো তবে কোনো চারণভূমি উৎপন্ন হতো না। (১)

(১) দ্রষ্টব্য: মুহাম্মদ বিন ইবরাহিম আল-ওয়াতওয়াত রচিত 'মাবাহিজুল ফিকর ওয়া মানাহিযুল ইবার', সম্পাদনা: ড. আবদুর রাজ্জাক আল-হারবি, (পৃষ্ঠা ২৮৭), এবং ওয়েবসাইট: www.hedweb.com/animimag/osteggs.jpg। আরও দেখুন: ইউসুফ আল-হাজ্জ আহমাদ রচিত 'মাওসুআতুল ইজাযিল ইলমি' (পৃষ্ঠা ২০৬-২০৯)। আর-রাযীর 'মাফাতিহুল গায়ব' (১/১৯)।

দ্বাদশ দিক: এই উক্তির প্রত্যুত্তর: "যদি কুরআন পৃথিবীর গোলাকৃতি সম্পর্কে অবগত থাকত, তবে মেরু অঞ্চলের মুসলমানদের সম্ভাব্য সমস্যাবলির আগাম সমাধান প্রদান করত।"

১. নবী মুহাম্মদ (সা.) হলেন কুরআনের বিষয়াবলির স্পষ্টকারী: তিনি পরিষ্কার করেছেন যে, মানুষ সম্ভবত এমন সময়ের মধ্য দিয়ে অতিবাহিত করতে পারে যখন সে নামাজের ওয়াক্তগুলো সম্পর্কে অবগত হবে না, চাই তা মহাজাগতিক প্রাকৃতিক কারণে হোক, যেমনটি ঘটে থাকে উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর অধিবাসীদের ক্ষেত্রে, অথবা মহাজাগতিক অস্বাভাবিক পরিস্থিতির কারণে—যেমনটি শেষ জামানায় মাসীহ দাজ্জালের উপস্থিতির সময়ে ঘটবে—অথবা মানুষ এমন কোনো অন্ধকার স্থানে বন্দী থাকার কারণে যেখানে সে সময় সম্পর্কে কিছুই জানে না।

নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ এক সকালে দাজ্জালের আলোচনা করলেন। তিনি তার আলোচনায় কখনো কণ্ঠ নিচু করলেন আবার কখনো উঁচু করলেন, এমনকি আমরা তাকে খেজুর বাগানের ঝোপের আড়ালে আছে বলে মনে করলাম। যখন আমরা তাঁর কাছে গেলাম, তিনি আমাদের মাঝে সেই অবস্থা লক্ষ্য করে বললেন: "তোমাদের কী হয়েছে?" আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি সকালে দাজ্জালের আলোচনা করেছেন এবং তার আলোচনায় কখনো কণ্ঠ নিচু করেছেন আবার কখনো উঁচু করেছেন, এমনকি আমরা তাকে খেজুর বাগানের ঝোপে আছে বলে মনে করছিলাম! আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! পৃথিবীতে তার অবস্থান কতদিন হবে? তিনি বললেন: "চল্লিশ দিন। এক দিন হবে এক বছরের মতো, এক দিন এক মাসের মতো, আর এক দিন এক সপ্তাহের

মতো। আর তার অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের সাধারণ দিনগুলোর মতোই হবে।" আমরা বললাম: হে আল্লাহর রাসূল! যে দিনটি এক বছরের মতো হবে, সেই দিনে কি আমাদের জন্য মাত্র একদিনের নামাজই যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: "না, তোমরা তার জন্য (সময়ের) সঠিক পরিমাপ করে নিও।" (১)

(১) সহীহ মুসলিম (৭৫৬০), কিতাবুল ফিতান ওয়া আশরাতুস সাআহ, অনুচ্ছেদ: দাজ্জালের আলোচনা, তার বৈশিষ্ট্য ও তার সাথে যা থাকবে।

শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল-উসাইমীন বলেন: আর যে স্থানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিবা-রাত্রির পর্যায়ক্রম ঘটে না, সেখানের অবস্থা দুই ধরনের হতে পারে; হয় এটি সারা বছর একইভাবে চলতে থাকে, অথবা বছরের মাত্র কয়েক দিনের জন্য এমন হয়। যদি তা বছরের মাত্র কয়েক দিনের জন্য হয়—যেমন এমন কোনো স্থান যেখানে বছরের অধিকাংশ ঋতুতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে, কিন্তু বিশেষ কোনো ঋতুতে দিন বা রাত চব্বিশ ঘণ্টা বা তার বেশি স্থায়ী হয়—তবে এই অবস্থায় দিগন্তে যদি এমন কোনো দৃশ্যমান লক্ষণ থাকে যার মাধ্যমে সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়, যেমন আলোর বৃদ্ধি শুরু হওয়া অথবা তা পুরোপুরি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, তবে বিধানটি সেই লক্ষণের সাথেই সংশ্লিষ্ট হবে। আর যদি সেখানে এমন কোনো লক্ষণ না থাকে, তবে চব্বিশ ঘণ্টা ব্যাপী রাত বা দিন শুরু হওয়ার ঠিক আগের শেষ দিনটির হিসাব অনুযায়ী নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারণ করা হবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি সেই দিনটিতে নিরবচ্ছিন্ন রাত শুরু হওয়ার আগে রাত বিশ ঘণ্টা এবং দিন বাকি চার ঘণ্টা স্থায়ী হতো, তবে আমরা এই নিরবচ্ছিন্ন রাতটিকে বিশ ঘণ্টা ধরব এবং বাকি সময়কে দিন হিসেবে গণ্য করব এবং নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারণের ক্ষেত্রে পূর্বের নিয়ম অনুসরণ করব।

আর যদি এমন স্থান হয় যেখানে বছরের কোনো ঋতুতেই চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিবা-রাত্রির আবর্তন ঘটে না, তবে সেখানে অনুমানের ভিত্তিতে নামাজের ওয়াক্ত নির্ধারণ করতে হবে; কারণ মুসলিম শরীফে নাওয়াস ইবনে সামআন (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, নবী দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করেছেন যা শেষ জামানার সময়, অতঃপর তাঁরা তাঁকে পৃথিবীতে তাঁর অবস্থানের বিষয়ে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন: "চল্লিশ দিন; একটি দিন এক বছরের মতো, একটি দিন এক মাসের মতো, একটি দিন এক সপ্তাহের মতো এবং তাঁর অবশিষ্ট দিনগুলো তোমাদের দিনগুলোর মতোই হবে।" তাঁরা জিজ্ঞেস করলেন: হে আল্লাহর রাসূল! সেই দিনটি যা এক বছরের মতো দীর্ঘ হবে, তাতে কি আমাদের জন্য একদিনের সালাত যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন: "না, বরং তোমরা তার জন্য যথাযথ পরিমাপ নির্ধারণ করে নাও।"

যখন এটি সাব্যস্ত হলো যে, যে স্থানে দিন ও রাতের স্বাভাবিক আবর্তন ঘটে না সেখানে সময় নির্ধারণ করতে হবে, তবে আমরা কিসের ভিত্তিতে তা নির্ধারণ করব? কিছু আলেম মনে করেন যে, তা স্বাভাবিক সময়ের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। ফলে রাতকে বারো ঘণ্টা এবং দিনকেও বারো ঘণ্টা হিসেবে ধরা হবে। কারণ যখন কোনো স্থানকে তার নিজস্ব অবস্থার ওপর বিচার করা অসম্ভব হয়ে পড়ে, তখন তাকে গড়পড়তা (মধ্যম) স্থানের সাথে তুলনা করা হয়; যেমন সেই ইস্তিহাযাগ্রস্ত (অস্বাভাবিক রক্তস্রাবগ্রস্ত) নারী যার রক্তস্রাবের কোনো নির্দিষ্ট সময়কাল বা পার্থক্য করার ক্ষমতা নেই। আবার অন্যগণ মনে করেন যে, উক্ত স্থানকে বছরের সেই সময়ে দিন ও রাত হওয়া নিকটবর্তী কোনো অঞ্চলের সময়ের সাথে মিলিয়ে নির্ধারণ করতে হবে। কারণ যখন কোনো স্থানকে তার নিজ অবস্থার ওপর বিচার করা অসম্ভব হয়,

তখন তার সাথে সর্বাধিক সাদৃশ্যপূর্ণ নিকটবর্তী স্থানের বিচারে তা নির্ধারণ করা হবে। আর সেটি হলো নিকটবর্তী সেই এলাকা যেখানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দিন ও রাতের আবর্তন ঘটে। এই মতটিই অধিক অগ্রগণ্য; কারণ এটি যুক্তির দিক থেকে অধিক শক্তিশালী এবং বাস্তবতার অধিক নিকটবর্তী। আর আল্লাহই সর্বজ্ঞ। (১)

২. মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না" - এটি সাধারণ এবং প্রত্যেকের জন্য প্রযোজ্য যে কোনো বিশেষ জরুরত বা ওজরের (অপারগতা) সম্মুখীন হয়।

ইমাম সারাখসী বলেন: জেনে রেখো, আদিষ্ট কাজ আদায় ওয়াজিব হওয়ার অন্যতম শর্ত হলো এমন সক্ষমতা থাকা যার মাধ্যমে আদিষ্ট ব্যক্তি তা পালন করতে সমর্থ হয়। কারণ মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ কোনো সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না।" আর যেহেতু যা ওয়াজিব তা হলো ইবাদত আদায় করা, আর ইবাদত হলো বান্দার স্বেচ্ছায় অর্জিত এমন কাজ যার মাধ্যমে সে তার রবের মহিমা ঘোষণা করে এবং সওয়াব লাভ করে। আর উক্ত সক্ষমতা ব্যতীত এটি অর্জন করা সম্ভব নয়। তবে আদেশের বিশুদ্ধতার জন্য আদেশ প্রদানের সময় সেই সক্ষমতা থাকা শর্ত নয়; কারণ আদেশ প্রদানের সময়ের বিদ্যমান সক্ষমতা দ্বারা কোনোভাবেই আদিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয় না। (২)

সুতরাং এই হাদিসটি কেবল মাসীহ দাজ্জালের সময়ের জন্য নির্দিষ্ট নয়; বরং এটি এমন সকল সময়ের জন্য প্রযোজ্য যখন মানুষ নামাযের ওয়াক্ত বা সময় চিনতে সক্ষম হয় না। কেননা মহান আল্লাহর বাণী: "আল্লাহ কোনো

সত্তার ওপর তার সাধ্যাতীত কোনো বোঝা চাপিয়ে দেন না" (সূরা আল-বাকারা: ২৮৬)। অতএব, শরীয়তের যে সকল আদেশ পালনে মানুষ অক্ষম, সে ক্ষেত্রে সে তার সাধ্যানুযায়ী আমল করবে।

(১) রিসালাতু মাওয়াকিতিস সালাত, এবং মাজমুউ ফাতাওয়া, দ্বাদশ খণ্ড।
(২) উসুলুস সারাখসী (১/৬৫)।

৩. একইভাবে, আমাদের অবশ্যই জানতে হবে যে কুরআন মানুষের যা কিছু প্রয়োজন তা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছে এবং তার সমস্যার সমাধান প্রদান করেছে, তা স্পষ্টভাবে হোক কিংবা পরোক্ষভাবে; সেই কারণে 'কিয়াস' ইসলামি শরিয়তের অন্যতম একটি উৎস। সুতরাং ইসলামি ফিকহে তাদের জন্য প্রচুর সমাধান রয়েছে যারা নামাজের সময়ের ব্যাপারে ওজরের সম্মুখীন হয়।

ইবনে তাইমিয়াহ বলেছেন: নামাজের সময়সমূহ স্বাভাবিক অবস্থায় পাঁচটি, আর ওজর ও জরুরতের অবস্থায় তিনটি। এর দলিল হলো আল্লাহ তাআলার বাণী: "আর তুমি সালাত কায়েম করো দিনের দুই প্রান্তে ও রাতের প্রথমাংশে।" এবং মহান আল্লাহর বাণী: "সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করো এবং ফজরের কুরআন পাঠ (সালাত) আদায় করো।" আর সুন্নাহ এ বিষয়ে সাব্যস্ত হয়েছে যে, ওজরের অবস্থায় জোহর ও আসর সূর্য ঢলে পড়া থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়া জায়েজ, এবং মাগরিব ও এশা সূর্যাস্ত থেকে ফজর উদয় হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে পড়া জায়েজ। আর এটাই হলো দুই নামাজের একত্রীকরণ (জম'উ); যখন কেউ প্রথম নামাজটি একত্র করার নিয়তে দেরি করে এবং কোনো ওজরের কারণে তা জরুরতের ওয়াক্ত পর্যন্ত পিছিয়ে যায়, তখন এটি

জরুরতের ওয়াক্ত হিসেবে গণ্য হবে। সুতরাং সে দ্বিতীয় নামাজের ওয়াক্তে যা প্রাপ্ত হবে তার মাধ্যমেই প্রথম ওয়াক্তের নামাজ আদায়কারী হিসেবে গণ্য হবে। (১)

(১) শারহু উমদাতিল ফিকহ ৪/২৩০; নামাজ ভঙ্গের কারণ অধ্যায়।

ত্রয়োদশ দিক: যারা দাবি করেন যে পৃথিবীর গোলত্ব একটি বৈজ্ঞানিক সত্য যা পবিত্র কিতাবে (বাইবেলে) উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের উত্তর।

প্রথমত: পবিত্র কিতাবে 'পৃথিবী গোলক' শব্দগুচ্ছটি একটি বিকৃত শব্দ:
কেননা যিশাইয় (৪০:২২)-তে আছে: (যিনি পৃথিবীর গোলকের উপর উপবিষ্ট এবং এর বাসিন্দারা ফড়িংয়ের মতো, যিনি আসমানকে পর্দার মতো বিস্তার করেন এবং বসবাসের তাঁবুর মতো ছড়িয়ে দেন)। কিন্তু সাধারণ অনুবাদ এই পূর্ববর্তী পাঠ থেকে ভিন্ন, যেখানে বলা হয়েছে: (যিনি পৃথিবীর গম্বুজের উপর উপবিষ্ট এবং এর বাসিন্দারা তাঁর নিচে ফড়িংয়ের মতো, আর তিনি একে বসবাসের তাঁবুর মতো ছড়িয়ে দেন)।

সুতরাং আরবি অনুবাদগুলোতে নামকরণের ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়; যেখানে একটি অনুবাদে বলা হয়েছে: (যিনি পৃথিবীর গোলকের উপর উপবিষ্ট), আবার অন্য অনুবাদে বলা হয়েছে: (যিনি পৃথিবীর গম্বুজের উপর উপবিষ্ট)।

এখন গম্বুজ কি গোলক? অথবা গোলক কি গম্বুজের মতো? এটি তো জানা কথা যে গম্বুজ হলো একটি অর্ধ-বৃত্তের ন্যায়। বিষয়টি আমাদের কাছে আরও পরিষ্কার হওয়ার জন্য আমাদের ইংরেজি অনুবাদের সাহায্য নেওয়া উচিত, চাই তা কিং জেমস সংস্করণ হোক কিংবা অন্য কোনো অনুবাদ আমেরিকান

বা অন্যান্যরা যারা বলে: *"It is he that sitteth upon the circle of the earth"* (তিনিই পৃথিবীর বৃত্তের উপর উঠে আছেন):

তবে কি 'circle' মানে গোলক? কোন ভাষায় পাওয়া যায় যে 'circle' মানে গোলক? সুতরাং সেখানে অবশ্যই কোনো ভুল আছে; হয় আরবি অনুবাদটি আমানতদারিতার সাথে করা হয়নি, অথবা ইংরেজি অনুবাদটি 'সরল'। আপনাদের কাছে কি অন্য কোনো সমাধান আছে?

দ্বিতীয়ত: আমাদের অবশ্যই সেই আদি ভাষায় ফিরে যেতে হবে যে ভাষায় পুরাতন নিয়ম (ওল্ড টেস্টামেন্ট) লেখা হয়েছিল। আসুন আমরা হিব্রু মূল পাঠে ফিরে যাই এবং বিখ্যাত স্ট্রং'স কনকর্ডেন্স ব্যবহার করি; উদ্ধৃতি:

compass, circuit, from 'chuwg' (2328); a circle: --circle

অর্থাৎ: গোলকত্বের ধারণার কোনো চিহ্নই সেখানে নেই। তবে আরবি অনুবাদের প্রবক্তারা এটি কোথা থেকে নিয়ে এলেন? আমরা হয়তো বুঝতে পারছি যে, আরবি অনুবাদের রচয়িতারা হিব্রু শব্দ (পৃথিবীর চাকতি)-কে তাদের পবিত্র গ্রন্থের এক প্রকার 'হালনাগাদকরণ' (Updating) হিসেবে 'পৃথিবীর গোলক' হিসেবে অনুবাদ করেছেন। কিন্তু আমাদের সামনে কোনো একজন ধর্মপ্রচারক এসে এই 'সংশোধিত' পাঠের মধ্যে বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার দাবি করবেন—এটি একটি 'রসিকতা' বৈ কিছু নয়। এছাড়া এটি হয় ইচ্ছাকৃত মিথ্যা অথবা অজ্ঞতাপ্রসূত প্রতারণা। অতএব, যদি পুরাতন নিয়মের আদি ভাষাগুলো এটা প্রমাণ না করে যে সেখানে 'গোলক' নামক কোনো শব্দ আছে যা যিশাইয় গ্রন্থের ৪০ অধ্যায়ের ২২ নম্বর পদে এসেছে, তবে আরবি অনুবাদে 'গোলক' শব্দটি কোথা থেকে এলো? এজন্যই

‘যৌথ অনুবাদ’ (Common Version) এই ভুলটি সংশোধন করে ‘গম্বুজ’ শব্দটি ব্যবহার করেছে। অথচ তারা জানে যে এর মূল উদ্দেশ্য হলো ‘বৃত্ত’, ‘গোলক’ বা ‘গম্বুজ’ নয়।

তৃতীয়ত: আমরা যখন এই অনুচ্ছেদটি পূর্ণ করি তখন আরেকটি আবিষ্কার দেখতে পাই; আর তা হলো—যিনি বৃত্ত বা গম্বুজের ওপর উঠে আছেন তিনি আসমানকে তাঁবুর মতো করেছেন, যেমনটি বলা হয়েছে: (যিশাইয় ৪০:২২) "তিনি আসমানসমূহকে চাঁদোয়ার মতো বিস্তার করেন এবং বসবাসের জন্য তাঁবুর মতো মেলে দেন।"

এর অর্থ হলো আকাশ সমতল। সুতরাং আমরা যদি উত্তর মেরুতে যাই তবে আকাশ দেখতে পাই, আবার দক্ষিণ মেরুতে গেলেও আকাশ দেখতে পাব; কারণ আকাশ তাঁবুর মতো হয়ে গেছে। তাঁবু যেমন নিচ থেকে সমতল, আসমানের নিচে পৃথিবীও কি তেমনি সমতল নয়?

চতুর্থত: পুরাতন নিয়মে ‘বৃত্ত’ এবং ‘গোলক’ শব্দ দুটির মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। তবে কেন পূর্ববর্তী আয়াতের হিব্রু পাঠে ‘বৃত্ত’ শব্দটি ব্যবহার করা হলো, অথচ অন্য আয়াতে ‘গোলক’ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে?

আমরা জানি যে, "গোলক" শব্দের মূল উৎস হলো "বৃত্ত"। অথচ এটি সুবিদিত যে, হিব্রু ভাষায় গোলক শব্দটি পরিচিত ছিল এবং পবিত্র কিতাবে (যিশাইয় ২২: ১৮) তা ব্যবহৃত হয়েছে: "তিনি তোমাকে শক্ত করে পেঁচিয়ে গোলকের মতো বিশাল এক প্রান্তরে ছুঁড়ে মারবেন। সেখানেই তুমি মারা যাবে এবং সেখানেই তোমার গৌরবের রথগুলো থাকবে, হে তোমার প্রভুর গৃহের কলঙ্ক।" এখানে ব্যবহৃত শব্দটি পূর্বে ব্যবহৃত শব্দ থেকে ভিন্ন। স্ট্রং’স

ডিকশনারিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৭৫৪ নম্বর শব্দ 'Duwr' (বা dure; H১৭৫২ থেকে আগত) এর অর্থ হলো: একটি বৃত্ত, বল বা স্তূপ, গোলাকার আবর্তন। এটি স্পষ্ট যে 'Duwr' শব্দটি "বৃত্ত" অর্থও প্রদান করতে পারে (যা আরবি শব্দ "দওর" এর সাথে ধ্বনিগতভাবে সাদৃশ্যপূর্ণ)। অপরদিকে 'Chuwg' শব্দটি নিয়ে পবিত্র কিতাবে অনুসন্ধান করে আরও তিনটি স্থান পাওয়া গিয়েছে: (আইয়ুব ২৬: ১০), যেখানে আরবি অনুবাদে এর অর্থ করা হয়েছে "সীমানা" এবং ইংরেজি অনুবাদে 'compass' (কম্পাস): "তিনি জলরাশির উপরিভাগে সীমানা অঙ্কন করেছেন যেখানে আলো ও অন্ধকারের মিলন ঘটে।" (আইয়ুব ২২: ১৪), যেখানে আরবি অনুবাদে এর অর্থ "বৃত্ত" এবং ইংরেজি অনুবাদে 'circuit': "মেঘ তাঁকে আবৃত করে রাখে ফলে তিনি দেখতে পান না, আর তিনি আকাশের বৃত্তের ওপর পদচারণা করেন।" (হিতোপদেশ ৮: ২৭), যেখানে আরবি অনুবাদে এর অর্থ "বৃত্ত" এবং ইংরেজি অনুবাদে 'compass' "যখন তিনি আকাশমন্ডল স্থাপন করছিলেন, তখন আমি সেখানে ছিলাম। যখন তিনি গভীর জলরাশির উপরিভাগে বৃত্ত অঙ্কন করছিলেন।" (আমার মতে, এই তিনটি স্থানেই সীমানার ধারণা বা 'compass' শব্দটি ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত)। তাই 'Chuwg' শব্দটির অর্থ "গোলক" হিসেবে গ্রহণ করার পেছনে খ্রিষ্টানদের ইচ্ছা ছাড়া অন্য কোনো কারণ নেই। আর এটি কেবল তাদের একটি আকাঙ্ক্ষা মাত্র, যা ভাষাতাত্ত্বিক অভিধানসমূহের কোনো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুপস্থিতিতে আমরা গ্রহণ করতে পারি না।

পঞ্চমত: বাইবেল থেকে অন্যান্য দলিল যা স্পষ্ট করে, পৃথিবী গোলাকার নয়:

স্বাভাবিকভাবেই এটি একটি প্রতিষ্ঠিত বিষয় যে, খ্রিষ্টীয় বিশ্বাস অনুযায়ী: প্রভু

ওহী বা প্রত্যাদেশের বাচনিক রূপদানের বিষয়টি লেখকের ব্যক্তিত্বের ওপর ছেড়ে দেন; লেখকের সংস্কৃতি ও পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি—তা পৌত্তলিক হোক বা অন্য কিছু—যেমন হবে, সে অনুযায়ীই ওহী রূপ লাভ করবে। আর এটি বিভিন্ন পুস্তকের বৈচিত্র্যের মাধ্যমে প্রকাশ পায়, যার মধ্যে রয়েছে সরল, সাহিত্যিক, কাব্যিক ও দার্শনিক রূপ। এর ফলে পৌত্তলিকতা ও অন্যান্য ইহুদি ধর্মের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটে। বাইবেলের মতো একটি কিতাব, যার রচনায় ডজন ডজন ব্যক্তি অংশগ্রহণ করেছেন এবং যাদের অধিকাংশেরই পরিচয় অজ্ঞাত, সেখানে এটি খুবই স্বাভাবিক যে তাদের মধ্যে কেউ একজন এমন মত গ্রহণ করবেন যা অন্যজন করেননি। এটি হতে পারে তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে, অথবা যেহেতু তিনি জ্ঞানগত ত্রুটিতে ভুগছিলেন।

এর মধ্যে একটি হলো এই যে, পৃথিবীর চারটি প্রান্ত রয়েছে:

১. "তিনি জাতিসমূহের জন্য একটি নিশান উড্ডীন করবেন এবং ইসরায়েলের নির্বাসিতদের একত্রিত করবেন, আর যিহূদার বিচ্ছিন্নদের পৃথিবীর চার প্রান্ত থেকে সমবেত করবেন।" (যিশাইয় ১১: ১২)।

দ্রষ্টব্য: একটি গোলকীয় বস্তুর চারটি প্রান্ত থাকা সম্ভব নয়; তবে যেকোনো সমতল আকৃতির ক্ষেত্রে এটি সম্ভব। উল্লেখ্য যে, ইংরেজি শব্দ 'corners' যা আরবিতে ‘আতরাফ’ (প্রান্তসমূহ) হিসেবে অনুবাদ করা হয়েছে, তার অর্থ হলো 'কোণসমূহ'। যদি পাঠ্যটিতে শুধু 'পৃথিবীর প্রান্তসমূহ' উল্লেখ থাকত, তবে আমরা এ নিয়ে কোনো মন্তব্য করতাম না। কিন্তু সেখানে প্রান্তের সংখ্যা চারটি বলে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। জ্যামিতিক দৃষ্টিকোণ থেকে সমতল

ক্ষেত্র (যেমন- আয়তাকার বা বর্গাকার) ছাড়া অন্য কোনো আকৃতির চারটি প্রান্ত থাকে না। এজন্যই পবিত্র কুরআনে এসেছে: **"তারা কি লক্ষ্য করে না যে, আমি জমিনকে চারপাশ থেকে সংকুচিত করে আনছি?"** (সূরা আর-রাদ: ৪১)। এখানে 'প্রান্তসমূহ' শব্দটি আমাদের নির্দেশ করে যে, প্রতিটি জিনিসেরই দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ থাকে যা দ্বারা তার আয়তন নির্ধারিত হয়; তেমনিভাবে তার উচ্চতাও থাকে। আমরা জানি যে, যেকোনো দৈর্ঘ্যের দুটি প্রান্ত থাকে। আর যদি কোনো বস্তু সমতল ক্ষেত্র হিসেবে থাকে, তবে তার বাহুর সংখ্যা অনুযায়ী তার প্রান্ত নির্ধারিত হয়। এজন্যই বাইবেল স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছে যে, পৃথিবী একটি সমতল আকৃতির (আয়তাকার বা বর্গাকার), কারণ এটি বাহুর সংখ্যা দ্বারা প্রান্ত নির্ধারণ করেছে। কিন্তু কুরআনে প্রান্তের কোনো সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়নি। কারণ জ্যামিতিকভাবে এটি সুপরিচিত যে, বৃত্তের পরিধির প্রতিটি বিন্দুই একটি প্রান্ত হিসেবে গণ্য হয়। এজন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন: **"আমি এর প্রান্তসমূহ থেকে কমিয়ে আনছি"** এবং তিনি কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা উল্লেখ করেননি। কেননা পরিধির প্রতিটি বিন্দুই একটি প্রান্ত। পক্ষান্তরে, বাইবেল পৃথিবীর প্রান্তসংখ্যা চারটি বলে নির্দিষ্ট করেছে; আর এটিই এর সবচেয়ে বড় প্রমাণ যে, বাইবেল অনুযায়ী পৃথিবী সমতল।

২. আর যারা দাবি করেন যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম) দিকসমূহ, তাদের উদ্দেশ্যে আমরা বলব: প্রান্তসমূহ এবং দিকসমূহের মধ্যে বিশাল পার্থক্য রয়েছে। বাইবেল কেন সঠিক শব্দটি ব্যবহারে ব্যর্থ হলো? অথচ বাইবেলের অন্যান্য স্থানে দিক সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, যেমন: (আদিপুস্তক ১৩: ১৪), (যাত্রাপুস্তক ২৬: ২০), (১ বংশাবলি ৯: ২৪): (চারটি দিকেই দ্বাররক্ষীরা ছিল—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও

দক্ষিণ), (দানিয়েল ৪: ১০): (আমার শয্যায় থাকাকালে আমি মনের চোখে এই দৃশ্য দেখলাম: আমি দেখলাম পৃথিবীর মাঝখানে একটি গাছ, যার উচ্চতা ছিল বিশাল...)।

পৃথিবী এবং এর দৈর্ঘ্য ছিল বিশাল; বৃক্ষটি বৃদ্ধি পেল ও শক্তিশালী হলো, ফলে এর উচ্চতা আকাশে পৌঁছাল এবং তা সমগ্র পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত দৃশ্যমান হলো। এর ইংরেজি অনুবাদ: "বৃক্ষটি বৃদ্ধি পেল এবং শক্তিশালী হলো, আর এর উচ্চতা আকাশ পর্যন্ত পৌঁছাল এবং তা পৃথিবীর শেষ সীমানা পর্যন্ত দেখা গেল।"

গোলীয় আকৃতির যেকোনো বিন্দুই মধ্যবিন্দু হতে পারে। ফলে 'পৃথিবীর মধ্যভাগ' বর্ণনাটি—যেমনটি দানিয়েল কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ের দশম চরণে এসেছে—তার কোনো অর্থই থাকে না, যদি না লেখক পৃথিবীকে একটি সমতল বস্তু হিসেবে কল্পনা করেন। একইভাবে দানিয়েল কিতাবের চতুর্থ অধ্যায়ের একাদশ চরণে বর্ণিত 'পৃথিবীর শেষ সীমা' অভিব্যক্তিটি পৃথিবীর প্রান্ত বা সীমানাকেই নির্দেশ করে। এর ইংরেজি অনুবাদ হলো: (পৃথিবীর প্রান্তসমূহ)।

৩. একইভাবে আইয়ুব (ইয়োব) কিতাবে (৩৮:১৩) যা এসেছে: "(যাতে তিনি) পৃথিবীর কিনারাগুলো ধরতে পারেন এবং পাপাচারীরা তা থেকে ঝেঁটিয়ে দূর হয়।" এর অনুবাদ হলো: "যাতে এটি পৃথিবীর প্রান্তসমূহকে ধারণ করতে পারে এবং পাপাচারীদের তা থেকে ঝেঁটে ফেলা হয়।" পৃথিবীর কিনারা; তাহলে পৃথিবীর শেষ বিন্দুটি কোথায়?

৪. এই আয়াতগুলোর রূপক ব্যাখ্যা করা একটি অত্যন্ত সাধারণ বিষয়। আমি

একমত যে এই অভিব্যক্তিগুলোর অনেকগুলোই রূপক অর্থে গ্রহণ করা সম্ভব। তবে এটি এই সম্ভাবনাকে নাকচ করে না যে, পবিত্র কিতাবের লেখকদের মহাজাগতিক ধারণাগুলো ত্রুটিপূর্ণ ছিল, বিশেষ করে 'পবিত্র কিতাবের অভ্রান্ততা' (ভুল থেকে সুরক্ষার) দাবির প্রেক্ষাপটে।

৫. এটা স্পষ্ট যে প্রাচীন ব্যাবিলনীয় এবং হিব্রুরা পৃথিবীকে একটি সমতল ভূমি হিসেবে কল্পনা করত যার প্রান্ত বা সীমানা রয়েছে। প্রবল ধারণা অনুযায়ী তারা একে বৃত্তাকার বা চাকতি আকৃতির মনে করত। আবার কেউ কেউ একে বর্গাকার মনে করত, আর তা সেই সব আয়াতের কারণে যা 'চার কোণ' নির্দেশ করে, যেমন: (যিশাইয় ১১: ১২) এবং (প্রকাশিত বাক্য ৭: ১)। পবিত্র কিতাবে পৃথিবীর আকৃতি সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা থাকুক বা না থাকুক, তবে তারা এই বিষয়ে একমত ছিল যে এটি সমতল।

অতএব, যে ব্যক্তি বাইবেলে পৃথিবীর গোলকত্বের ঘোষণার দাবি উপস্থাপনে সচেষ্ট হয়, সে কেবল নিজের সেই আকাঙ্ক্ষাকেই তুলে ধরে যা আমরা ভাষাগত অভিধানসমূহের কোনো নির্ভরযোগ্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণের অনুপস্থিতিতে এগুলোর উত্তর দিতে পারি।

অনুরূপভাবে আরও একটি বিষয়: পৃথিবী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান:

পৃথিবী স্তম্ভের উপর দণ্ডায়মান এবং শূন্যে ঝুলন্ত থাকা প্রসঙ্গে পবিত্র বাইবেল নিচের আয়াতগুলোতে আমাদের সামনে এই চিত্র তুলে ধরে: "যিনি পৃথিবীকে তার স্থান থেকে বিচলিত করেন, ফলে তার স্তম্ভসমূহ কাঁপতে থাকে" (আইয়ুব ৯:৬)। (ইংরেজি অনুবাদে স্তম্ভসমূহ: pillars, হিব্রু মূলে ammuwd। এই শব্দটি ১১১ বার ব্যবহৃত হয়েছে, যার মধ্যে ১০৯ বার এর

অর্থ ছিল: স্তম্ভ বা খুঁটি। একবার এর অর্থ ছিল: ‘তারা’ বা ‘তাদের’ (them) এবং তা স্তম্ভগুলোর দিকেই নির্দেশ করেছে। আর একবার এর অর্থ ছিল: ‘প্রত্যেকের জন্য’, যা স্তম্ভগুলোর দিকেই নির্দেশ করেছে। ‘কিংস’ বা রাজাবলির প্রথম খণ্ডের (৭:১৫) আয়াতে এই দুইবারের উল্লেখ পাওয়া যায়, স্ট্রং’স ডিকশনারির (Strong's Concordance) বর্ণনা অনুযায়ী। এর চেয়েও বিস্ময়কর বিষয় হলো, আইয়ুবের বই আমাদের জানায় যে, পৃথিবীর মতো আসমানেরও স্তম্ভ রয়েছে (আইয়ুব ২৬:১১)।

সুতরাং আসমানের স্তম্ভ রয়েছে এবং পৃথিবীর ভিত্তি ও স্তম্ভ রয়েছে, যদিও তা শূন্যে ঝুলন্ত। এই ধারণাটিকে একটি নতুন ধারণা হিসেবে গণ্য করা হয় যা প্রাচীন জাতিগুলোর ধারণার সাথে যুক্ত হয়েছে। প্রাচীন জাতিগুলো মনে করত যে পৃথিবী অ্যাটলাসের কাঁধে, অথবা কচ্ছপের পিঠে, কিংবা হাতির ওপর, অথবা ষাঁড়ের শিংয়ের ওপর অবস্থিত... ইত্যাদি। আইয়ুবের বইয়ের লেখক মনে করতেন পৃথিবী শূন্যের ওপর ঝুলে আছে, তবে তিনি বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে যেমনটি আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। এরপর প্রভু আইয়ুবকে সম্বোধন করে প্রকাশ করেন যে পৃথিবী সমতল এবং এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ রয়েছে। তিনি বলেন (আইয়ুব ৩৮:১৮): “তুমি কি পৃথিবীর প্রশস্ততা বুঝতে পেরেছ? যদি তুমি এই সমস্ত কিছু জানো তবে বলো।” প্রশ্নের এই ধরণটি আমাদের কাছে স্পষ্ট করে দেয় যে, প্রভু আইয়ুবের কাছে প্রকাশ করেছেন যে পৃথিবীর প্রশস্ততা রয়েছে এবং আইয়ুব তার পুরোটা বুঝতে পারেননি বরং কেবল তার একটি অংশ বুঝেছেন। অন্য একটি আয়াতে আছে: “তিনি পৃথিবীকে তার ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছেন, যেন তা অনন্তকাল টলমল না করে” (সামস ১০৪:৫)। প্রকৃতপক্ষে, এই আয়াতে হিব্রু শব্দ

makown-এর অর্থ হিসেবে ইংরেজি অনুবাদে foundations শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ওল্ড টেস্টামেন্টে এই শব্দটির অন্যতম প্রচলিত অর্থ হলো (স্থান)। সেই হিসেবে আয়াতের অর্থ হতে পারে: (যিনি পৃথিবীকে তার স্থানে স্থির রেখেছেন যেন তা অনন্তকাল বিচলিত না হয়), যা পৃথিবীর স্থিরতা ও গতিহীনতাকে নির্দেশ করে। তাহলে গোলাকার পৃথিবী কীভাবে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে? আর কোথায়ই বা এই ভিত্তিগুলো? যেহেতু পৃথিবীর ভিত্তি রয়েছে, তাই তা স্থির ও গতিহীন হয়ে পড়েছে। (১)

(১) আনসারিং ক্রিশ্চিয়ানিটি ওয়েবসাইট (ইসলামি)
www.answering-christianity.com/earth_flat.htm

ইহুদি ও নাসারাদের পবিত্র গ্রন্থসমূহে যা বর্ণিত হয়েছে, তার সাথে তুলনা করলে এর সঠিকতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; যখন তারা দাবি করেছে যে পৃথিবীর চারটি কোণ রয়েছে! প্রকাশিত বাক্য (৭/১)-এ এসেছে: "এর পর আমি দেখলাম, চারজন ফেরেশতা পৃথিবীর চার কোণে দাঁড়িয়ে আছেন; তারা পৃথিবীর চার বায়ুকে আটকে রেখেছেন, যেন স্থলভাগ বা সমুদ্র কিংবা কোনো বৃক্ষের ওপর দিয়ে বায়ু প্রবাহিত না হয়।" অনুরূপভাবে যিহিষ্কেল (৭/২)-এ আছে: "পৃথিবীর চার কোণে শেষ সময় ঘনিয়ে এসেছে।" তাহলে কোন কিতাবটি সমালোচনার অধিক যোগ্য—পবিত্র কুরআন (যা পৃথিবী থেকে কোণের ধারণা নাকচ করেছে), নাকি বাইবেল যা তা সাব্যস্ত করেছে?!

চতুর্দশ দিক: প্রাচীনকালের খ্রিস্টান পণ্ডিতগণ বিশ্বাস করতেন যে পৃথিবী সমতল, গোলাকার নয়; এমনকি সমকালীনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা এটি বিশ্বাস করে।

পূর্বোক্ত আলোচনার নিরিখে আমরা বলি: এই পাঠটি বিকৃত, অথবা পৃথিবী

গোলাকার হওয়ার পাঠটি বিকৃত। কারণ এই দুটি পাঠের একটিতে অবশ্যই বিকৃতি রয়েছে; আর এর প্রমাণ হলো মধ্যযুগে গির্জা ও যাজকদের ভুল উপলব্ধি। সুতরাং যে পাঠটি বলছে পৃথিবী বর্গাকার, সেটিই সেই যুগে প্রচলিত ছিল। এর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে অন্য পাঠটি বাতিল ও বিকৃত এবং বাইবেলের পাণ্ডুলিপিতে একটি সংযোজন হিসেবে এসেছে।

কারণ যদি এই পাঠটি মধ্যযুগে বিদ্যমান থাকত, তবে পৃথিবী বর্গাকার হওয়ার ধারণাটিই জন্ম নিত না। আর যেমনটি আমরা জানি যে যাজকরাই সবচেয়ে বেশি বাইবেল পাঠ করেন; তবে কি যাজকরা পুরাতন নিয়মের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ (যিশাইয়)-এর সেই পাঠটি দেখতে অন্ধ ছিলেন এবং তাদের চোখ কেবল সেই পাঠটিই দেখেছিল যা স্বীকার করে যে পৃথিবী বর্গাকার? নাকি খ্রিস্টানরা মনে করে যে তারা সেই সময়ের যাজকদের চেয়ে বেশি সমঝদার? এবং মধ্যযুগের সকল যাজক কি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন যে তারা এই পাঠটি পড়েননি?! সুতরাং এই স্পষ্ট ও দ্ব্যর্থহীন পাঠ (যেমনটি তারা দাবি করেছে) থাকা সত্ত্বেও তারা বিশ্বাস করে যে পৃথিবী একটি সমতল চাকতি... তাহলে এই 'বৈজ্ঞানিক' ও 'পরিমিত' বক্তব্যের বাস্তবতা কী?!

আমাদের বর্তমান বিশ্বে কিছু রক্ষণশীল খ্রিস্টান রয়েছেন যারা তাদের কিতাবি বিশ্বাসের ওপর অটল যে পৃথিবী সমতল, যেমন: স্যামুয়েল বার্লি রোবোথাম (Samuel Birley Rowbotham)।

আধুনিক সমতল পৃথিবী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা এবং গ্লেন উইলবার ভোলিভার (Glenn Wilbur Voliva) মতো ব্যক্তিরা, যিনি সমতল পৃথিবীর প্রবক্তা বিখ্যাত আমেরিকানদের একজন।

পঞ্চদশ দিক: পূর্ববর্তীদের নিকট বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রমাণ।

ইমাম ফখরুদ্দিন আর-রাযীও বুদ্ধিবৃত্তিক পদ্ধতিতে পৃথিবীর গোলাকার হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন এবং বলেছেন: পৃথিবীর অবস্থা সম্পর্কিত বিষয়সমূহের অন্যতম হলো এটি একটি গোলক। আপনি জেনেছেন যে, পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যবর্তী পৃথিবীর বিস্তারকে 'দৈর্ঘ্য' বলা হয় এবং উত্তর ও দক্ষিণের মধ্যবর্তী বিস্তারকে 'প্রস্থ' বলা হয়। সুতরাং আমরা বলব: পৃথিবীর দৈর্ঘ্য হয় সোজা (সমতল), অথবা অবতল, অথবা উত্তল হতে হবে।

প্রথম বিষয়টি বাতিল; অন্যথায় সূর্যোদয়ের সময় পৃথিবীর পুরো উপরিভাগ একসাথেই আলোকিত হয়ে যেত এবং সূর্যাস্তের সময় একসাথেই অন্ধকার হয়ে যেত। কিন্তু বিষয়টি এমন নয়। কারণ যখন আমরা একটি সুনির্দিষ্ট চন্দ্রগ্রহণকে বিবেচনা করি এবং তার চারটি অবস্থার (গ্রহণের শুরু, পূর্ণ গ্রহণ, মোক্ষণ শুরু এবং পূর্ণ মোক্ষণ) একটি নির্ভুল সময় নির্ধারণ করি, তখন দেখা যায় দৈর্ঘ্যের পার্থক্যের কারণে বিভিন্ন জনপদে তা একই সময়ে ঘটে না। পূর্ব দিকের জনপদে রাতের যতটা অংশ অতিক্রান্ত হয়েছে, পশ্চিম দিকের জনপদে তার চেয়ে বেশি অংশ অতিক্রান্ত পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় বিষয়টিও বাতিল; অন্যথায় পশ্চিমের জনপদে অতিক্রান্ত রাত পূর্বের জনপদের তুলনায় বেশি হতো; কারণ প্রথমত অবতল অংশের পশ্চিমে ঘটনা আগে ঘটবে, এরপর তার পূর্বে ঘটবে।

যখন এই দুই প্রকার বাতিল হয়ে গেল, তখন প্রমাণিত হলো যে পৃথিবীর দৈর্ঘ্য উত্তল। এরপর এই উত্তলতা হয় গোলাকার হবে অথবা মসুর সদৃশ

(লেন্স আকৃতির) হবে। দ্বিতীয় বিষয়টিও বাতিল; কারণ আমরা দেখি যে পরিধির অংশসমূহের ব্যবধান অনুযায়ী একটি একক চন্দ্রগ্রহণের সময়ের ব্যবধানও ভিন্ন ভিন্ন হয়। এমনকি সুদূর প্রাচ্যের জনপদে রাতের শুরুতে যে চন্দ্রগ্রহণটি ঘটে, তা সুদূর পাশ্চাত্যের জনপদে দিনের শুরুতে পাওয়া যায়। ফলে প্রমাণিত হলো যে দৈর্ঘ্যের দিক থেকে এটি গোলাকার।

আর পৃথিবীর প্রস্থের ক্ষেত্রে কথা হলো, এটি হয় সমতল, অথবা অবতল, অথবা উত্তল হবে। প্রথম বিষয়টি বাতিল; অন্যথায় দক্ষিণ থেকে উত্তর মেরুর দিকে ভ্রমণকারী ব্যক্তির জন্য মেরুর উচ্চতা বৃদ্ধি পেত না এবং তার জন্য এমন কোনো নক্ষত্র প্রকাশিত হতো না যা অক্ষাংশের ভিন্নতা অনুযায়ী সর্বদা উদিত থাকে।

দ্বিতীয় বিষয়টিও বাতিল; অন্যথায় মেরুর দিকে ক্রমাগত অগ্রসর হওয়ার কারণে সর্বদা দৃশ্যমান নক্ষত্রগুলো দৃষ্টির আড়ালে চলে যেত। আর অবতল অবস্থায় মেরুর উচ্চতা এবং তার ধারাবাহিকতা হ্রাস পেত না—যেমনটি আমরা সাতটি স্তরের বর্ণনায় অকাট্যভাবে প্রমাণ করেছি। শহরসমূহের অক্ষাংশের ভিন্নতা অনুযায়ী যা অর্জিত হয়। এই যুক্তিটি তার উপস্থাপনার চমৎকারিত্বের কারণে সন্তোষজনক।

দ্বিতীয় যুক্তি: পৃথিবীর ছায়া গোলাকার, সুতরাং পৃথিবী গোলাকার হওয়া আবশ্যক।

প্রথম বিষয়ের ব্যাখ্যা: চন্দ্রগ্রহণ হলো মূলত পৃথিবীর ছায়া; কারণ সূর্য ও চন্দ্রের মাঝে পৃথিবী অন্তরায় হওয়ার ফলে চন্দ্রের মূল সত্তা থেকে আলো অপসারিত হওয়া ছাড়া গ্রহণের আর কোনো অর্থ নেই। এরপর আমরা বলব: চন্দ্রগ্রহণ গোলাকার; কেননা আমরা গ্রহণের ফলে চাঁদের যে অংশটুকু ঢাকা

পড়ে তা গোলাকার দেখি। আর যখন এটি সাব্যস্ত হলো, তখন পৃথিবী গোলাকার হওয়া আবশ্যক; কারণ ছায়ার বিস্তৃতি ঘটে সূর্যের কিরণে আলোকিত অংশ এবং অন্ধকার অংশের মধ্যবর্তী সাধারণ বিভাজন রেখার আকৃতি অনুযায়ী। সুতরাং ছায়া যখন গোলাকার হয়, তখন সেই সাধারণ বিভাজন রেখাও গোলাকার হওয়া আবশ্যক যা পূর্ণ ছায়ার আকৃতি দান করে। ফলে প্রমাণিত হলো যে পৃথিবী গোলাকার। অধিকন্তু, এই কথাটি পৃথিবীর কেবল এক দিকের সাথে নির্দিষ্ট নয়; কারণ চন্দ্রগ্রহণের কারণসমূহ রাশিচক্রের সকল অংশে একইভাবে কার্যকর হয়, অথচ গ্রহণের আকৃতি সর্বদা গোলাকারই থাকে। অতএব পৃথিবী সব দিক থেকেই গোলাকৃতির।

তৃতীয় যুক্তি: পৃথিবী আসমান থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে চায়; আর যখন পৃথিবীর সকল অংশের অবস্থা এমনই হয়, তখন পৃথিবী গোলাকার হওয়া আবশ্যক; কারণ ছায়ার বিস্তৃতি গোলকাকার। যারা পৃথিবীর গোলকত্বের ওপর আপত্তি তুলেছেন তারা দুটি বিষয়ের মাধ্যমে যুক্তি পেশ করেছেন:

প্রথমটি: পৃথিবী যদি গোলক হতো তবে এর কেন্দ্র জগতের কেন্দ্রের সাথে মিলে যেত। আর যদি তা-ই হতো তবে পানি পৃথিবীকে সব দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখত; কারণ পানির স্বভাবজাত ধর্ম হলো কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হওয়া, যার ফলে পানি সমগ্র পৃথিবীকে ঢেকে রাখা আবশ্যক হয়ে পড়ত।

দ্বিতীয়টি: আমরা পৃথিবীতে যেসব টিলা, সুউচ্চ পাহাড় এবং অত্যন্ত গভীর গর্ত দেখতে পাই (তা গোলকত্বের পরিপন্থী)।

তারা প্রথম আপত্তির উত্তরে বলেন যে, ঐশ্বরিক তত্তাবধান ও হিকমত

প্রাণীদের বসবাসের উপযোগী করার জন্য পৃথিবীর একটি অংশকে সমুদ্রের দ্বীপের ন্যায় পানির ওপর প্রকাশ করা আবশ্যক করেছে। এছাড়া পৃথিবীর কোনো কোনো দিক থেকে নিচু ও গভীর জায়গাগুলোর দিকে পানির গড়িয়ে যাওয়াও অসম্ভব নয়; আর এমতাবস্থায় পৃথিবীর কিছু অংশ পানি থেকে প্রকাশ পাবে।

আর দ্বিতীয় আপত্তির উত্তরে বলা হয় যে, এই উঁচু-নিচু ভূপ্রকৃতি পৃথিবীকে গোলক হওয়া থেকে বিচ্যুত করে না। তারা বলেন: উদাহরণস্বরূপ আমরা যদি এক হাত ব্যাস বিশিষ্ট কাঠের একটি গোলক নিই, এরপর তাতে মিহি দানা বা চুলের ন্যায় কিছু বস্তু স্থাপন করি এবং সেগুলোর তুলনা করি, তবে তা গোলকটিকে তার গোলাকার অবস্থা থেকে বের করে দেয় না। পৃথিবীর তুলনায় পাহাড় ও গর্তের অনুপাত তো এর চেয়েও নগণ্য সেই স্থির বস্তুসমূহ ছোট গোলক পর্যন্ত — সমাপ্ত। (১)

(১) তাফসিরে রাযী, ২/৪৯১; আল-বাক্বারাহ: ১৬৪)

আর-রাযী বলেছেন: নিশ্চয়ই জমিনকে বিস্তৃত করা বলতে একে এমনভাবে প্রসারিত করা বুঝায় যার শেষ সীমা উপলব্ধি করা যায় না। আল্লাহ তাআলা জমিনের আয়তনকে এত বিশাল করেছেন যে, দৃষ্টি এর শেষ প্রান্তে পৌঁছে না। আর গোলক যখন অত্যন্ত বিশাল হয়, তখন এর প্রতিটি অংশকে একটি সুষম সমতল পৃষ্ঠের ন্যায় দেখা যায়।

তিনি আরও বলেছেন: 'মাদ্দ' (বিস্তৃত করা) হলো এমনভাবে প্রসারিত করা যার শেষ সীমানা নজরে আসে না। সুতরাং মহান আল্লাহর বাণী: "আর তিনিই সেই সত্তা যিনি জমিনকে বিস্তৃত করেছেন" — এটি ইঙ্গিত দেয় যে,

আল্লাহ তাআলা জমিনের আয়তনকে অত্যন্ত বিশাল করেছেন যা দৃষ্টির অগোচর; কারণ জমিন যদি বর্তমান আয়তনের চেয়ে ছোট হতো, তবে এর থেকে উপকার লাভ পূর্ণাঙ্গ হতো না। আর গোলক যখন অত্যন্ত বিশাল হয়, তখন এর প্রতিটি অংশকে সমতলের মতো দেখা যায়। আল্লাহ তাআলার বাণী: "তারা কি দেখে না যে, আমি জমিনকে এর প্রান্তসমূহ থেকে সংকুচিত করে আনছি? আল্লাহ নির্দেশ দেন, তাঁর নির্দেশকে রদ করার কেউ নেই। তিনি দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।" (আর-রা'দ: ৪১), এবং তাঁর বাণী: "তারা কি দেখছে না যে, আমি জমিনকে এর প্রান্তসমূহ থেকে সংকুচিত করে আনছি? তবে কি তারাই বিজয়ী?" (আল-আম্বিয়া: ৪৪)। এটি সেই ব্যক্তির জন্য স্পষ্ট যে জমিনের মধ্যভাগ থেকে এর যেকোনো প্রান্তের দিকে ভ্রমণ করে, আর এটি কেবল গোলাকার আকৃতির ক্ষেত্রেই সম্ভব।

গাযযালী তাঁর 'তাহাফুতুল ফালাসিফাহ' গ্রন্থে বলেছেন: চন্দ্রগ্রহণ বলতে চন্দ্রের আলো বিলুপ্ত হওয়াকে বুঝায়, যখন পৃথিবী সূর্য ও চন্দ্রের মাঝখানে অবস্থান করে। কারণ চাঁদ সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে। আর পৃথিবী একটি গোলক এবং আসমান একে সবদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছে। সুতরাং চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ায় পড়ে, তখন সূর্যের আলো তার ওপর পৌঁছাতে বাধাগ্রস্ত হয়। যেমন তাদের উক্তি: সূর্যগ্রহণ মানে হলো দর্শক ও সূর্যের মাঝে চন্দ্রের দেহের অবস্থান করা, আর তা ঘটে তাদের সংযোগকালে।